কালকেতুর মৃগয়ার তেজে ফুল্লরা বাজারে মহিষের শৃঙ্গ, সন্ন্যাসীর বাঘছাল, একপণ দরে গণ্ডারের খড়্গ প্রভৃতি বেচিতে লাগিল। কালকেতু মৃগয়া হইতে আসিয়া ফুল্লরা-প্রদত্ত "হরিণের ছড়া"য় বসিয়া মোকা নারিকেল ভরা জলের সদ্ব্যবহার করিয়া ভোজনের ব্যাপারটা কেমনে সমাধা করিতেন, ক্ষুদ্রপ্রাণ বাঙ্গালী পাঠক, একবার শুন।

"সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিয়া পাথরা।
বাঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা॥
মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বাঁধে নিয়া ঘাড়ে।
এক শ্বাসে তিন হাঁড়ি আমানি উজাড়ে॥
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় ক্ষুদ-জাউ।
দালি খাল্য ছয় হাড়ি মিশাইয়া লাউ॥
ঝুড়ি দুই তিন খাল্য বনওল পোড়া।
বনপুই ভার দুই কলমা কাঁচড়া॥
ফুল্লরা রন্ধন করে জ্বালে গোটাবাশ।
ঝোল রান্ধি দিল দুটা হরিণের মাস॥
দশ গণ্ডা মহাবীর খায় নকুল পোড়া।
সার কচুর ঘণ্ট খায় মিশায়্যা আমড়া॥
অম্বল খাইয়া বীর জায়াবে জিজ্ঞাসে।
রন্ধন ক'রেছ ভাল আর কিছু আছে॥
আন্যাছি হরিণ দিয়া দধি এক হাঁড়ি।
তাহা দিয়া খাব্ব ভাত আর তিন হাঁড়ি॥
শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিট্‌কাল।
ছোটগ্রাস তোলে যেন তেআঁঠিয়া তাল॥
ভোজন করিতে গলা ডাকে ঘড় ঘড়।
কাপড় উসাস্ করে যেন মড়ায়ের বড়॥"

দুঃখের বিষয়, কবি কালকেতুর উদরের পরিমাণটা দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমাদিগকেও পাঠকের কৌতূহল অতৃপ্ত রাখিতে হইল। এই অতিশয়োক্তির ভিতর স্বাভাবিকতার এমন একটী মূল আছে, যাহাতে পাঠকের বিরক্তি জন্মিতে দেয় না।

কালকেতুর অত্যাচারে বনের পশু অস্থির হইয়া উঠিল। দন্তহীন হস্তী, রুধিরাক্ত মহিষ, লাঙ্গুলশূন্য চমরী, বিধবা হরিণী প্রভৃতি সকলে রাজার দ্বারে গিয়া নালিশ জানাইল। পশু-রাজ রাজপ্রথানুসারে কোটালকে ভর্ৎসনা করিয়া যুদ্ধসজ্জা করিলেন এবং যথাকালে চণ্ডীর নিকটে গিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। পশুগণের সহিত চণ্ডীর উত্তর প্রত্যুত্তরে মনস্বী সমালোচকগণ কোন গভীর রাজ-নৈতিক আলোচনার রূপক দেখিতে পান, ভালই। আমাদের কিন্তু সমগ্র চণ্ডীকাব্য পড়িয়া মনে হয়, দামুন্যার সরলপ্রাণ, নিরীহ ব্রাহ্মণ কবি রাজনীতি বা এখন যাহাকে দেশহিতৈষিতা বলে, তাহার বড় একটা ধার ধারিতেন না। তিনি তাৎকালিক সাধারণ মানবসমাজের চিত্র এবং দেবার মাহাত্ম্য সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবারই প্রয়াস পাইয়াছেন। যাহা হউক, পশুগণের আবেদনে কালকেতুর পক্ষে শাপে বর হইল। পশুগণকে অভয় দিয়া দেবী স্বয়ং স্বর্ণ-গোধিকা রূপ ধারণ করিলেন। কালকেতু অনেকক্ষণ মৃগারূপধারিণী দেবীর বৃথা অনু-সরণ করিয়া অবশেষে গোধিকারূপ-ধারিণী দেবীকে গৃহে লইয়া আসিলেন। ভগবতীকে ফুল্লরা শিকপোড়া দিবার পূর্ব্বেই তিনি নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ষোড়শী যুবতী হইয়া ফুল্লরার সহিত ছলনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কালকেতু কেবল দৈহিক বলে বলীয়ান্ নহেন, তিনি জিতেন্দ্রিয়। ষোড়শী যুবতীকে গৃহ ছাড়িয়া যাইবার জন্য তিনি অনেক অনুরোধ করিলেন, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, অবশেষে ধনুকে শর যোজনা করিলেন। দেবীর উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া; তিনি নিজের পরিচয় দিয়া কেলি-

লেন, গুজরাট বনে ব্যাধকে রাজ্য বসাইতে পরামর্শ দিলেন এবং মাণিক অঙ্গুরী ও সাত ঘড়া ধন দান করিলেন। কালকেতু মুরারি শীলের নিকট অঙ্গুরী ভাঙ্গাইয়া "বলদ শকটে" করিয়া বাড়ীতে ধন লইয়া আসিলেন এবং পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী নানা দ্রব্য কিনিয়া ফেলিলেন। বন কাটা হইল—দেবীর আদেশে বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমান গুজরাট নগর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ব্যাধকালকেতু রাজা কালকেতু হইলেন। বুলান মণ্ডল, ভাঁড়ু দত্ত প্রভৃতি কালকেতুর নগরে আসিয়া হাজির হইল। নানা জাতীয় লোক আসিয়া বসতি করিল—পশ্চিম দিকে নমাজের ব্যবস্থাও থাকিল। দালান, মসজিদ কিছুরই অভাব থাকিল না। কালকেতু হীনাবস্থা হইতে উন্নতি-লাভ করিলেও প্রজারঞ্জক রাজা হইলেন। প্রজার প্রতি অত্যাচারের জন্য ভাঁড়ুদত্তকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিলেন। ভাঁড়ু কালকেতুর নিকট পূর্ব্বে উপকার পাইয়াছিল, এখন অপরাধের জন্য দূরাকৃত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল—

"পুনরপি হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা।"

সে কলিঙ্গরাজের নিকট কালকেতুর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করিল। কলিঙ্গরাজ কোটালের উপর যথারীতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গুজরাটরাজের খবর আনিতে আদেশ দিলেন। ক্রমে রাজপুত্র গুজরাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কালকেতু তেজস্বী বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কবি এ পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্র যে তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছিলেন, জানি না কি দুরদৃষ্টক্রমে সে তুলিকা হারাইয়া ফেলিলেন। বাঙ্গালীর ঘরের আদর্শ তুলিকা লইয়া কালকেতুর উজ্জ্বল বর্ণের উপর কালীর লেপ দিয়া ফেলিলেন। দ্বিতীয়বার যুদ্ধসজ্জা করিবার সময়ে কালকেতু ফুল্লরার কথায় সাহস বিসর্জ্জন দিয়া ধান্যের গৃহে গিয়া লুকাইলেন। ভাঁড়ুদত্তের কপটতায় তাঁহার সে গৃহও বেষ্টিত হইল। বাধ্য হইয়া কালকেতুকে আবার একাকী যুদ্ধ করিতে হইল। কিন্তু কালকেতু শাপভ্রষ্ট দেবকুমার, তাঁহার শাপের কাল ফুরাইয়া আসিল, দেবী তাঁহার বল হরণ করিলেন। কালকেতু বন্দী হইয়া কলিঙ্গের রাজসভায় নীত হইলেন। কালতাঁহার তেজ আবার ক্ষণেকের জন্য ফিরিয়া আসিল। কবি আবার যথাসাধ্য কালীটুকু পুঁছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কালকেতু উত্তর করিলেন—

"গুজরাট নিবাসী নবাস চণ্ডীপুর।
আমার রাজ্যের রাজা মহেশ ঠাকুর॥
আমি বটি মহাপাত্র চণ্ডী অধিকারী।
তাঁর আজ্ঞা ধরি আমি তাঁর আজ্ঞাকারী॥

* * * *

বেচিয়াছি আপন তনু চণ্ডিকার পায়।
তোমার তাড়নে কালকেতু না ডরায়॥

কলিঙ্গরাজের কারাগার কালকেতুর বাসভূমি হইল। তিনি আবার অনেক খেদ করিয়া চণ্ডিকার স্তুতি করিলেন। কলিঙ্গরাজ দেবীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া কালকেতুকে বন্ধনমুক্ত করতঃ গুজরাটের রাজা করিয়া দিলেন। ইহার পর ভাঁড়ুদত্তের মস্তকমুণ্ডন এবং কালকেতুর শাপান্ত ও স্বর্গারোহণ।

ফুল্লরার চরিত্রও সুনিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত ফুল্লরা ব্যাধপত্নী। কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরের স্ত্রীলোক। তাহার চরিত্রের উজ্জ্বল ও অন্ধকার দুই দিকই কবি দেখাইয়াছেন। সে

দুই দিকেই ষোড়শ শতাব্দীর দেশীয় নিম্ন-শ্রেণীস্থ স্ত্রীলোকের আদর্শ দেদীপ্যমান্।

ফুল্লরা বাল্যকাল হইতেই পসরা ও রন্ধন করিতে সুদক্ষ। বিবাহের পর তাহার শাশুড়ী "বৈসে খাটে," আর সে শাশুড়ীর আদেশমত পসরা করে, হাট হইতে জিনিষ-পত্র কিনিয়া আনে, শাশুড়ীর নিকট তাহার বিবরণ বলে, তাঁহার আদেশ মত রন্ধন করে এবং শ্বশুরকে আগে ভোজন করায়। শ্বশুর শাশুড়ী শেষ বয়সে "বারাণসী কবিল পয়ান", কাজেই তখন ফুল্লরা গৃহিণী হইল। এই অবস্থায় তাহার সাংসারিক কার্য্যে পটুতা, তাহার পতিসেবা, তাহার সখীর সঙ্গে সদ্ভাব, মাথার উকুন দেখা প্রভৃতির কবি যেমন সুদৃশ্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেইরূপ তাহার দারিদ্র্যের জন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার, দরিদ্রপতির হস্তে সমর্পণের জন্য পিতার উপর অভিমান, সপত্নী-ভীতি-স্বাভাবিক ভীরুতা প্রভৃতিরও সুন্দর আলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন।

ষোড়শী যুবতীর মূর্ত্তিধারিণী দেবীকে কুটীরের দ্বারে দেখিয়া এবং তাঁহার এই কুটীরে কিছুদিন বাস করিবার ইচ্ছা শ্রবণ করিয়া ফুল্লরার যে কি অবস্থা হইয়াছিল, ফুল্লরার সহিত দেবীর কথোপকথনে কবি তাহার পরিচয় দিয়াছেন। এই কথোপকথনের ছত্রে ছত্রে যেন ফুল্লরার অন্তঃকরণ প্রতিফলিত হইয়াছে। ফুল্লরা দারিদ্র্যের জন্য অভিমানের অনেক কথা কহিয়া শেষে এক সখীর নিকট কিছু ক্ষুদ ধার করিয়া রাঁধিবার জন্য বাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু দেবীকে দেখিয়া—

"হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা।
দূর হইল ক্ষুধা তৃষা রন্ধনের ত্বরা॥"

অনেক ধর্ম্মবাক্য, অনেক প্রলোভন, অনেক ভয় দেখাইয়া ফুল্লরা দেবীকে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিল—গরজ বড় বালাই। দেবীকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া বারমাসের দুঃখ বর্ণনা করিল এবং অবশেষে অভিমান ভরে সখীর নিকট গিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিল। যখন দেবী কালকেতুকে মাণিক অঙ্গুরী দান করিলেন, তখন——

"এই অঙ্গুরীর মূল্য সাত কোটী টাকা।
ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ করে বাঁকা॥
ফুল্লরার অভিপ্রায় বুঝিবা পার্ব্বতী।
আর কিছু ধন দিতে কৈল অনুমতি॥"

সুযোগ বুঝিলে এখনও কি বাঙ্গালী-রমণী টাকা আদায় করিতে জানেন না? ফুল্লরার প্রধান অপযশের কার্য্য পতিকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধান্যের ঘরে প্রবেশের পরামর্শ দেওয়া। ফুল্লরা রামায়ণ হইতে বালী রাজার দোহাই দিয়া মহাবীর কাল-কেতুকে ধান্যের ঘরে পাঠাইল। কবি এই-খানে বাঙ্গালী-রমণী চরিত্রের যে আদর্শ অঙ্কিত করিয়াছেন, পাঠক, বিংশ শতাব্দীতেও তাহা দেখিতে পান না কি? পতিকে লুকাইয়া রাখিয়াও ফুল্লরা ভাঁড়ুদত্তের কপটতার নিকট পরাস্ত হইল। চতুর ভাঁড়ু দত্ত ফুল্লরার ভাবগতিক দেখিয়াই আসল অবস্থা বুঝিয়া লইল। তাহার পর পতির উপর অত্যাচার দেখিয়া ফুল্লরা কোটালের নিকট যে কাকুতিমিনতি করিল, তাহার হৃদয়স্পর্শী বর্ণনাও কবি খাঁটি বাঙ্গালীর ঘর হইতেই লইয়াছেন। কোটালকে ফুল্লরা গলার শতেশ্বরী হার ছিঁড়িয়া দিতে উদ্যত হইল এবং কহিল—

"চুরী নাহি করি কোটাল ডাকা নাহি দি।
ধন দিয়া গেল দুর্গা হেমন্তের ঝি॥

গো মহিষ রাজ্য লহ অমূল্য ভাণ্ডার।
নফর করিয়া রাখ স্বামীকে আমার॥

*　*　*　*　*

*　*　*　*　*

কারু নহি লই রাজ্য কাক এক পণ।
তৌলিয়া গণিয়া রাজা লউক যত ধন॥
নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ।
এক অসি ঘায়ে আগে ফুল্লরাবে হান॥"

কালকেতু খণ্ডের আর দুইটী উল্লেখ-যোগ্য চরিত্র মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্ত। মুরারি শীলের নিকট কালকেতু যখন অঙ্গুরী "ভাঙ্গাইতে গেলেন, তখন একের কপটতা ও অপরের সরলতার যে ছবি কবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সুদক্ষ চিত্রকর ব্যতীত কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ভাঁড়ু দত্ত ধূর্ত্ততা ও খলতার একটী জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। কালকেতুর সম্পদের সময়ে সে কাঁচকলা ভেট লইয়া আপন শ্যালককে পশ্চাতে রাখিয়া 'কলম খরশান' কর্ণে গুঁজিয়া ব্যাধরাজের নিকটে হাজির হইল এবং প্রণাম করিয়া বীরের সহিত খুড়া সম্বন্ধ পাতাইল। 'গন্ধক কায়স্থ দেখ, ভাঁড়ুর পশ্চাতে লিখ' ইত্যাদি বলিয়া এই আমলাভাড়ার দত্ত আপনার কুলগরিমা কীর্ত্তন করিল এবং রাজার পাত্র হইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিল। প্রজার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে রাজাকে অনেক উপদেশ দিল এবং রাজার অধীনে থাকিয়া সপুত্র প্রজার উপর নানা অত্যাচার আরম্ভ করিল। কালকেতু অগত্যা তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইলেন। ভাঁড়ু দত্ত কলিঙ্গরাজের নিকট গিয়া কালকেতুর বিরুদ্ধে রাজাকে উত্তেজিত করিবার জন্য অনেক বক্তৃতা করিল এবং অবশেষে বলিল—

"শোয়রি তোমার গুণ শুধিতে আইলাম লোণ
বারতা জানাইবার তরে॥"

লুণ শোধা লোকই বটে! যখন যুদ্ধে কালকেতু জয়লাভ করিলেন, তখন ভাঁড়ু মহাচিন্তায় পড়িল—

"পরিবার রহিল মোর পাপ গুজরাটে।
কহিতে কাঁকড়ি যেন বুক মোর ফাটে॥"

যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত কোটালকে তাহার বিরুদ্ধে রাজার নিকট লাগাইবে বলিয়া ভয় দেখাইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইল, অবশেষে তাহার ব্রহ্মাস্ত্র কপটতা দ্বারা পূর্ব্বপ্রভু কালকেতুর বন্ধনের বন্দোবস্ত করিয়া দিল। কে অস্বীকার করিবে যে, এই হতভাগিনী বঙ্গভূমিতে অনেক ভাঁড়ু দত্ত জন্মিয়াছে? নতুবা বক্তিয়ার খিলিজিও তাঁহার সপ্তদশ জন অশ্বারোহীর কথা আমরা শুনিব কেন?

কাব্যের তৃতীয় খণ্ডে ধনপতিকে কেন্দ্র করিয়া অনেক চরিত্র বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ধনপতি গন্ধবণিক জাতীয়—অর্থশালী ব্যবসায়ী লোক। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী খুল্লনা শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রের নর্ত্তকী রত্নমালা। এই খুল্লনা দ্বারাই দেবী স্ত্রীমহলে পূজা প্রচলনের প্রয়াসী। ধনপতি শিবপূজক এবং 'মাইয়া দেবতার' বিরোধী। পারাবতের অনুসরণ করিতে গিয়া ধনপতি কুমারী খুল্লনার নিকট পৌঁছিলেন—খুল্লনা তাঁহার সাধের পায়রা বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সম্বন্ধে ধনপতির শ্যালিকা, তাঁহার প্রথম স্ত্রী লহনার পিতৃব্যকন্যা, সুতরাং পরিহাস করিবার তাঁহার অধিকার ছিল। কিন্তু পারাবত চাহিতে চাহিতে ধনপতির লোভ কিছু উচ্চদরের হইয়া গেল। শেষে আর পারাবতে তৃপ্তি হইল না, পারাবতধারিণী খুল্লনাকে

পর্য্যন্ত চাহিয়া বসিলেন। জনাই ওঝার ঘটকালীতে শীঘ্রই সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। ধনপতি লহনাকে পাটসাড়ী ও চুড়ি গড়াইবার জন্য পাঁচ পল সোণা দিয়া তাঁহার আপত্তি খণ্ডন করিলেন। যথাকালে খুল্লনা ধনপতির দ্বিতীয়া স্ত্রী রূপে তাহার গৃহ উজ্জ্বল করিলেন। কিন্তু বিধাতার প্রাণে এ সুখ সহিল না। শীঘ্রই এক আশ্চর্য্য শারীশুক আসিয়া উজানীর রাজা বিক্রমকেশরীর আতিথ্য স্বীকার করিল। তাহাদের উপযুক্ত পিঞ্জর নির্ম্মাণের জন্য ধনপতি নৃপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গৌড় নগরে গমন করিলেন। এই অবসরে দুর্ব্বলা দাসীর প্ররোচনায় লীলাবতী সখীর সাহায্যে লহনা খুল্লনাকে ছাগরক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। লহনা ধনপতির যে আদেশপত্র খুল্লনার নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন, খুল্লনা তাহা বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে বয়োধিকা লহনার নিকট পরাস্ত হইয়া ছাগরক্ষণ কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই ছাগরক্ষণের বিবরণ স্থানে স্থানে কিছু অস্বাভাবিকতাদুষ্ট হইলেও মোটের উপর গভীর করুণরসাত্মক ও মর্ম্মস্পর্শী। খুল্লনা ছাগচারণ করিতে গিয়া প্রভূত কষ্ট ভোগ করিল। একদিন যখন খুল্লনা শ্রান্তকলেবরে পল্লবশয়নে তরুতলে নিদ্রা দেবীর অঙ্কে শান্তিলাভ করিতেছেন, তখন দৈবযোগে দেবী সেই স্থান দিয়া "আকাশ গমনে" যাইতেছিলেন। খুল্লনাকে দেখিয়া দেবীর কৌতূহল জন্মিল। রত্নমালার কথা দেবীর স্মরণ না থাকা পাঠকের নিকট বিস্ময়জনক হইতে পারে, কিন্তু মুকুন্দরাম যে দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার জন্য কাব্য লিখিয়াছেন, তাঁহার স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা পাঠক গ্রন্থের অনেক স্থলেই অনুভব করিবেন। দেবী বাধ্য হইয়া চতুরা পদ্মাবতীর শরণাপন্না হইলেন। পদ্মাবতী খুল্লনার পরিচয় দিলেন এবং দেবীকে রত্নমালা সংক্রান্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলেন। পূজালাভের এই উপযুক্ত অবসর। দেবী খুল্লনার মাতার মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার শিয়রে বসিয়া স্বপ্নে ছলনা করিলেন—খুল্লনার ছাগী স্থানান্তরে লুক্কায়িত রাখিলেন, দেবকন্যাগণ দ্বারা সরোবরতীরে পূজার বন্দোবস্ত করা হইল—উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তই শ্রেয়ঃ। খুল্লনা দেবকন্যাগণের নিকট পরিচয় দিয়া এবং তাঁহাদের পরিচয় লইয়া পূজার পদ্ধতি শিখিয়া ফেলিলেন। দেবী ব্রাহ্মণীবেশে খুল্লনার একটু পরীক্ষা লইয়া অবশেষে বর দান করিলেন। লহনাকে স্বপ্নাদেশ দিলেন। খুল্লনার কপাল ফিরিল—সপত্নীর নিকটে অত্যাচারের পরিবর্ত্তে আদর পাইলেন। এদিকে ধনপতিও গৌড় নগরে স্বপ্নাদেশ পাইয়া সুবর্ণ পিঞ্জরসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তার পর দুই সপত্নীতে প্রতিযোগিতা চলিল। দুর্ব্বলাদাসী সুযোগমত লহনাকে পতিবশীকরণের ঔষধ দান করিতে ও খুল্লনাকে লহনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। ধনপতির গৃহে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল। দেবীর প্রসাদে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় বিবিধ দ্রব্য ধনপতির রসনার তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল। কবি আহার, নিদ্রা, সপত্নী-বিদ্বেষ ও বিলাসিতার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমরা অনেক দূরবর্ত্তী সময়ে থাকিয়াও তাহা উপভোগ করিবার অধিকারী।

ক্রমে খুল্লনার গর্ভসঞ্চার হইল। ইন্দ্রপুত্র মালাধর শাপগ্রস্ত হইয়া সেই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তার পর ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে আর একটী কলহপরিণামক

ব্যাপার। কবি নিপুণ হস্তে এই ব্যাপারের আলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। গ্রাম্য দলাদলির যে ফটোগ্রাফ তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে যেন সেই চান্দবেণে, নীলাম্বর, রামরায় প্রভৃতি সজীব ভাবে আমাদের মানসচক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়াছে। ধনপতি চাঁদ বেণেকে প্রথম মালাচন্দন দেওয়াতে গন্ধবণিক সমাজের নেতৃগণের মধ্যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কেহ রামায়ণ,কেহ হরিবংশ হইতে অংশ বিশেষ শুনিবার ভাণ করিয়া খুল্লনার চরিত্রের উপর সন্দেহ ও শ্লেষের বিষবাণ বর্ষণ করিতে লাগিল, খুল্লনার হস্তে খাওয়া হইবে না। ধনপতি ফাঁফরে পড়িলেন, কিন্তু দেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশের এই উপযুক্ত সময়। খুল্লনা চণ্ডীর কৃপায় বিবিধ ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আপনার সতীত্বের পরিচয় দিলেন। কাজেই 'কুটুম্ব'গণের ভোজনও 'মধুরেণ' সমাপিত হইল। কিন্তু ধনপতির অদৃষ্টে গৃহসুখ বিধাতার ইচ্ছা নহে। রাজসংসারে চন্দনাদি দ্রব্যের অভাব হইল এবং ধনপতির প্রতি দক্ষিণ পাটনে যাইবার আদেশ হইল। ধনপতি অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া এবং লহনা ও খুল্লনার নবযৌবনের উল্লেখ করিয়াও নিষ্কৃতি পাইলেন না। কবি লহনাকে সাধারণ সপত্নী করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন। স্বামী খুল্লনাকে অধিকতর প্রীতির চক্ষে দেখেন, ইহা তাঁহার সহ্য হয় না। তিনি স্বামীর বিদেশ গমনের সংবাদে হৃষ্ট হইলেন, কারণ তাহাতে 'সুয় দুয় সমান হৈল'। ধনপতি গর্ভবতী খুল্লনাকে জয়পত্র এবং মাণিক অঙ্গুরী প্রভৃতি নিদর্শন দিয়া, গণককে অনিষ্টাশঙ্কা গণনার জন্যে নফর দিয়া ধাক্কা দেওয়াইয়া ভ্রমরার জল হইতে সাতডিঙ্গা উঠাইলেন এবং বিনিময়ের দ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাহার নমুনা এইরূপ—

কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব।
নারিকেল বদলে শঙ্খ ॥

* * * *
* * * *

প্লবঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব।
পায়রা বদলে শুয়া ॥

* * * *
* * * *

আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব।
হরিতাল বদলে হীরা ॥

ক্রমশঃ

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

কমলাকান্ত-কথা-লহরী। (৩)

প্রঃ। যদি বিরক্ত না হন, তবে আজ একটা প্রস্তাব করি।

উঃ। বিরক্ত হইবার কারণ কি? তোমাদের রুচি ও ইচ্ছার অনুযায়ী যেরূপ বলিতে চাও, অনায়াসে বলিতে পার।

প্রঃ। পুরাতন কথা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া যদি বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী কোন কথা পাড়ি, তাহাতে কি আপনার কোন আপত্তি আছে?

উঃ। কিছুমাত্র না; তোমরা যেমন শুনিতে চাও, আমি তেমনি বলিতে প্রস্তুত।

প্রঃ। আপত্তি যদি না থাকে, তবে

শিবাজীর কথা আপাততঃ রাখিয়া আমাদিগকে আধুনিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলুন; পরে তখন শিবাজীর বিষয়ে যাহা কিছু বাকী আছে, শুনিব।

উঃ। ও বাবা! তোমরা বুঝি এই তুমুল তুফানের মধ্যে আমাকে ফেলিতে চাও। এই জরাজীর্ণ শরীর মন লইয়া এবম্বিধ ভীষণ আলোড়নের অভ্যন্তরে পড়িলে কি এই ক্ষুদ্র প্রাণ টিকিবে? এ প্রাণ কোন প্রকারে দেহে থাকিয়া ধুক্ ধুক্ করিতেছে মাত্র, একটু সামান্য ওলট্‌পালট্ খাইলেই অমনি খপ্ করিয়া বিদায় লইবে। এ সকল বিট্‌কেল ব্যাপারের নাড়াচাড়া সবল সুস্থ উদ্যমশীল যুবাপুরুষদের কাজ, আমরা হরিনাম জপিতে জপিতে কোন রূপে তালি তুলি দিয়া শেষ কয়টা দিন কাটাইতেছি, আমরা কি এসব ধাক্কা সাম্‌লাইতে পারি?

প্রঃ। সে কি! কথায় বলে "পুরাতন চাউল ভাতে বাড়ে," আপনাদের মুখ হইতে যাহা শুনিব, তাহাতে আমাদের বিশেষ উপকার হইবে।

উঃ। আমাদের কথা কি এখন বাজারে বিকায়? চারি দিকে যেরূপ কোলাহল শুনিতেছি, এ দুর্ব্বল কণ্ঠের রব কোথায় ভাসিয়া যাইবে। অধুনা যেরূপ ঘটিয়াছে, তাহাতে ত দেখিতেছি, জমীদার জমীদারী ছাড়িয়া, মহাজন তেজারতী ছাড়িয়া, সওদাগর বাণিজ্য ছাড়িয়া, বারিষ্টার চেম্বর ছাড়িয়া, উকীল ওকালতী ছাড়িয়া, ডাক্তার চিকিৎসা ছাড়িয়া, পণ্ডিত শাস্ত্র ছাড়িয়া, ভট্টাচার্য্য টোল ছাড়িয়া, কবি বুলবুলির বর্ণনা ছাড়িয়া, ছাত্র পাঠশালা ছাড়িয়া, কুলবধূ গৃহস্থালী ছাড়িয়া, চাষা লাঙ্গল ছাড়িয়া, তাঁতী তাঁত ছাড়িয়া, কামার হাতুড়ি ছাড়িয়া, ছুতার বাঁশ ছাড়িয়া রাজনীতিক্ষেত্রে আসিয়া হুঙ্কার রবে আপনাপন মতামত ব্যক্ত করিতেছে। এবম্বিধ হুলস্থূল ব্যাপারের মধ্যে আমাদের কথা কে শুনিবে?

প্রঃ। বাজারে না বিকাইলেও আমাদের কাছে খুব বিকাইবে। আপনি বলুন, দেশের আধুনিক আন্দোলন সম্বন্ধে আপনার কি বক্তব্য।

উঃ। কি জান, অধিক দিন জীবিত থাকিলেই অনেক দেখা যায়। যাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহাই ঘটিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি। আগে মনে করিতাম, শীঘ্র শীঘ্র ইহলোক হইতে পলায়ন করিতে পারিলেই ভাল, কিন্তু এখন মনে করি, আরও কিছু দিন বাঁচি, আরও কিছু দেখি। যেমন লঙ্কাবিজয়ের পর রাবণ-জননী নিকষা রামচন্দ্রের নিকট দীর্ঘায়ুর জন্য বর প্রার্থনা করায় তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এরূপ কামনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধা বলিয়াছিল, "রাম! এ জীবনে লঙ্কেশ্বর দশাননের কত না বৈভব পরাক্রম দেখিলাম; আবার আজ বীর পুত্র পৌত্রগণের শোকে জর্জ্জরিত হইয়া সোণার লঙ্কাপুরী ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়াইয়া আছি, আর কিছু দিন বাঁচিলে আরও কি না দেখিব!"

প্রঃ। বাস্তবিকই আপনি অনেক দেখিলেন, ভগবানের কৃপায় দীর্ঘজীবী হইয়া আরও দেখিবেন। দেশের অবস্থা এখন কি বুঝিতেছেন?

উঃ। দেশের অবস্থা কুব্যবস্থায় হীন হইয়া পড়িয়াছে। রাজা ও প্রজার ধর্ম্মে অনাস্থাবশতঃ উভয়ে পাশব শক্তি অবলম্বনে প্রয়াসী। একদিকে বস্তা বস্তা আইনের চাপ-প্রয়োগ, অপর দিকে শাসককে আত্মা-

মাবুদ করিবার অভিপ্রায়ে নানাবিধ চোরা-গোপ্তা উপায় অবলম্বনের উদ্যোগ। এরূপ সস্তায় কাজ সারিতে গিয়া দেশটাকে উৎসন্নের রাস্তায় যে ধাক্কা দিয়া ফেলা হইতেছে, তাহা কাহারও খেয়াল নাই। এ হেন দুর্দ্দিন বুঝি ভারতে আর কখন হয় নাই—রাজা প্রজা উভয়ের পক্ষে আজ বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। সাধারণ ভাবে ত এই বলিলাম। এখন বিশেষ কথা কি জানিতে চাও, প্রশ্ন কর, উত্তর দিতেছি। দেশের ছোট বড় নেতৃপুরুষগণ কে কিরূপ মতামত প্রচার করিতেছেন, রাজপুরুষদিগের মধ্যেই বা কিরূপ জল্পনা চলিতেছে, শুনিলে যথাযথ মন্তব্য প্রকাশ করিব।

প্রঃ। প্রথমে মোটা কথা পাশব শক্তি প্রয়োগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, অবস্থানুযায়ী উহার ফলাফল কিরূপ সম্ভবে শুনাইয়া কৃতার্থ করুন।

উঃ। কেবলমাত্র আসুরিক বলের দ্বারা কখন কোথাও কোন কাজ সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় নাই, যদি হইয়া থাকে, দুই দিনের জন্য। দেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া যে অবস্থা আনা হয়, তাহা কোন প্রকারে স্থায়ী হইতে পারে না। সাংসারিক লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে বটে :—"বলং বলং বাহুবলং," পরন্তু তদুপরি উচ্চ কথা :—"বলং বলং ব্রহ্মবলং।" ঈশ্বর কৃপা ব্যতীত কোন দেশে কোন কালে কোন রূপ কল্যাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এখন দেখিতে হইবে, ঈশ্বর-কৃপার অর্থ কি। ভগবানের দয়া যখন-তখন যাহার-তাহার প্রতি হয় না [illegible] ভগবদনুগ্রহ লাভ করা সাধন-সাপেক্ষ, সাধনা ভিন্ন তাঁহার প্রসাদে কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হয় না। যাহা হউক, ও সকল সূক্ষ্ম কথা রাখিয়া স্থূল দৃষ্টিতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এখন তাহারই আলোচনা করা যাউক। আমি জানিনা, কিন্তু যদি তোমাদের মধ্যে কোনরূপ মারকাট্‌পন্থীর দল থাকে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, মার্‌কাট্‌ করিবার উদ্যোগে যে সকল আন্তরিক ও বাহ্যিক উপকরণের দরকার, তাহার যোগাড় কৈ? শুনিতেছি "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া মুখে ও কলমে নানা সুরে বিস্তর ফাঁকা আওয়াজ হইতেছে এবং "রণনীতি" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়া কতকগুলি যুবকের হস্তে শোভা পাইতেছে। "মাথা নাই তা'র মাথাব্যথা"—রণ কোথায়? কাহার সঙ্গে রণ যে, তজ্জন্য যুদ্ধের প্রণালী শিখিবার এত তাড়াতাড়ি পড়িয়াছে? সুদূর বিদেশে কোথাও যুদ্ধ বাধিয়াছে, সংবাদপত্রে পড়িতে ভাল, কোন একপক্ষ অবলম্বন করিয়া বা নিরপেক্ষ ভাবে ঘটনাবলীর সমালোচনা করিতে বেশ; নিকটে কোথাও সংগ্রাম ঘটিলে নিরাপদে কোন সু-উচ্চ স্থান হইতে দর্শনলাভের সুযোগ যদি পাওয়া যায়, নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু সমরের হাঙ্গামা পোহাইতে পারা দূরে থাকুক, উহার আঁচ গায়ে লাগিলেও ত তাত্‌ সহিবে না। একটা ঘটনা মনে পড়িয়া হাস আসিতেছে :—পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল কলিকাতা মেডিকেল কলেজের দেশীয় ও ফিরিঙ্গি ছাত্রদের মধ্যে একটা মারামারি হয়,—মারামারি বলিলে দোষ হয়, কারণ এক পক্ষই বিশেষ রূপে প্রহৃত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে একজন বাঙ্গালী ছাত্রকে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে দেখিয়া জনৈক পথিক কৌতূহলবশাৎ তদবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, পলায়মান যুবক দৌড়িতে দৌড়িতে উত্তর করিলেন,

"আমি এখন ডেস্পাবেট্" (মরিয়া) হইয়াছি।" তাই ভাবি, রণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে আমাদিগের প্রায় সকলকেই ঐরূপ ভাবে "ডেস্পাবেট্" হইতে হইবে। এই ত আমাদের কাব্দানি! বাক্যুদ্ধে, মসিযুদ্ধে আমরা সিদ্ধহস্ত বটে, ঐ দুই রকম যুদ্ধে আমাদিগকে হটায় এমন কেহ আজও জন্মে নাই, কিন্তু আসল যুদ্ধের উপযোগী মানসিক, দৈহিক ও বাহ্যিক সম্বল আমাদের কি আছে, বলিতে পার কি? হৃদয়ের বল, শরীরের বল, লোকের বল ও অস্ত্রশস্ত্রের বল, এতগুলি বলের উপর সুশৃঙ্খলা, সুপ্রণালী ও সুব্যবস্থা চাই, তবে যুদ্ধ হয়; যুদ্ধ ত ফলার নয় যে চিড়া, দই, চিনি, মর্ত্তমান রম্ভা একত্রে মাখিয়া সপাসপ গলাধঃকরণ করা হইবে। শুধু নুন লেবু যোগাড় করিয়াই যদি আহারের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে, মনে করি, সেটা মন্দ কথা নয়, কিন্তু উহাতে ত ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হয় না। কথায় বলে,—"বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছি, তবে যাহা কিছু কষ্ট অন্নবস্ত্রের।" আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাও সকল দিকে তদ্রূপ দাঁড়াইয়াছে। এরূপ-ক্ষেত্রে রণের কথা মনে মনে ভাবাও ঘোরতর বাতুলতা, মুখে আনা দূরে থাকুক। যদি বল, যুদ্ধ ব্যতীত এ নিগড় খসাইবার উপায় কি? তবে কি কল্পান্ত পর্য্যন্ত আমাদিগকে এই শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কাটাইতে হইবে? উহা ত অসম্ভব; প্রকৃতির সনাতন নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ওরূপ বিশ্বাস কি প্রকারে করি? সুতরাং স্বাধীনতা-লাভোদ্দেশে রণনীতির আলোচনা আবশ্যক হইয়াছে। তদুত্তরে আমাকে প্রশ্ন করিতে হয়, নিজ বাহুবলে পরাধীনতাপাশ মোচন করিবার সময় কি অদূরবর্ত্তী? ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ত একবার গা-নাড়া দিয়া চেষ্টা করা হইয়াছিল, ফলে কি দাঁড়াইল? বরং সে সময় কতক আশার কথা ছিল, কারণ তখন এতটা শিকড় বসে নাই; কিন্তু বিধাতার পঞ্জিকায় কেবলমাত্র বিফল বিপ্লবই লেখা ছিল, কাজেই সব ফাঁসিয়া গেল। সিপাহী যুদ্ধের কথা আমাদের মধ্যে বৃদ্ধদিগের বিলক্ষণ স্মরণ আছে, মনে পড়িলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। অবশ্য তাহাতে রাজা প্রজা উভয়েরই অনেক শিক্ষা লাভ হইয়াছে। উক্ত ব্যাপারের বিষয় এখানে কিছু আলোচনা করিলে ক্ষতি নাই। বাঙ্গালা মুলুকে বেশী উৎপাত হয় নাই, অরাজকতা, অত্যাচার, যুদ্ধাদি বিহার প্রদেশের পশ্চিমাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত প্রবল প্রকোপের সহিত চলিয়াছিল। অনন্যগতি দুর্ব্বল ভীরু বাঙ্গালীরা বরাবর কোম্পানির পক্ষে থাকিয়া রাজশক্তির বিশেষ সাহায্য করিতে ত্রুটি করে নাই। এ কারণ পশ্চিম-প্রবাসী বাঙ্গালীর দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। আমাদের দুইজন আত্মীয় (স্ত্রী পুরুষ) বিবস্ত্র অবস্থায় জঙ্গলে শালপাতা সেলাই করিয়া লজ্জা নিবারণ করতঃ ভিক্ষা করিতে করিতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ভোলানাথ চন্দ্র নামক এক ব্যক্তি তাঁহার পর্য্যটন-গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন—

"The Bengalees at Allahabad cowered in fear, and awaited within closed doors to have their throats cut. The women raised a dolorous cry at the near prospect of death."—Travels of a Hindoo.

অর্থাৎ এলাহাবাদের বাঙ্গালীরা ভয়ে জড়সড় অবস্থায় বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া জপিতেছিল, কখন্ বিদ্রোহীর দল আসিয়া তাহাদের গলা কাটিয়া দিবে; স্ত্রীলোকেরা

আসন্ন মৃত্যু ভাবিয়া গভীর দুঃখব্যঞ্জক স্বরে রোদন আরম্ভ করিয়াছিল। বাস্তবিক এলাহাবাদ, মিরাট প্রভৃতি স্থানে তখন ভয়ানক অরাজকতা, বিদ্রোহী সিপাহীগণের সঙ্গে দেশের দুর্বৃত্ত পিশাচপ্রকৃতি দস্যুরা যোগ দিয়া অকুতোভয়ে উদ্দাম নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছিল, গৃহদাহ, নরহত্যা, লুণ্ঠন, রমণীর প্রতি পাশব ব্যবহার, শিশুবধ তাহাদের নখাগ্রে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৮৫৭ সালের যে মাসে কোম্পানির অধীনে ৪৫০০০ গোরা ও ২৪৪০০০ কালাসৈন্য এবং ৮০০০০ মিলিটারি পুলিস ছিল, এই ৩২৪০০০ দেশীয় সিপাহীর মধ্যে মোটে ৬০০০০ বশে থাকে, বাকী সমস্ত বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। নামকাটা ও পেন্সনপ্রাপ্ত সিপাহীগণের মধ্যেও অনেকে কোম্পানির বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে, সুতরাং ন্যূনাধিক আড়াই লক্ষ শিক্ষিত সেনার সঙ্গে ইংরাজকে যুদ্ধ করিতে হয়। তবে সুবিধার বিষয় এই যে, পঞ্জাব হইতে ৯০০০০ শিখসৈন্য আসিয়া বিপ্লবক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, ৪০০০০ গোরাও বিলাত হইতে পঁহুছে এবং নেপাল হইতে স্বয়ং জঙ্গ বাহাদুর কয়েক সহস্র গুর্খা পদাতিক সহ অবতরণ করেন; এতদ্ব্যতীত দেশীয় নৃপতি-বৃন্দ সকলেই আপনাপন ফৌজ দিয়া ইংরাজকে যথাশক্তি সাহায্য করিয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি সাম্রাজ্যের সাধারণ প্রকৃতিবর্গ হৃদয়ের সহিত বৃটিশসিংহের জয় কামনা করতঃ যাহার যেমন সাধ্য সহায়তা করিতে ত্রুটি করে নাই; শ্বেতাঙ্গের ন্যায়বিচারের প্রতি তাহাদের এরূপ গভীর আস্থা ছিল। কলিকাতার কালীঘাটে, কাশীর বিশ্বনাথ-মন্দিরে, এইরূপে নানা স্থানস্থ দেবালয়-সমূহে ইংরাজরাজের জয়োদ্দেশে বিহিত পূজার্চনা হইয়াছিল।

আর একটা কথা, তোমরা হয় ত বিশ্বাস করিবে না যে, যে সকল জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ মানবসমাজের কল্যাণ-সাধনে রতী হইয়া হিমালয়-প্রদেশে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নসহকারে বৃটিশপক্ষে আনুকূল্য করিয়াছিলেন। ইহা আমার কথা নয়, সিনেট নামক জনৈক ভারত-ফেরত ইংরাজ তাঁহার একখানি গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন :—

"Many old Indians, and some books about the Indian Mutiny, take note of the perfectly incomprehensible way news of events transpiring at a distance would sometimes be found to have penetrated the native bazaars before it had reached the Europeans at such places by the quickest means of communication at their disposal. The explanation, I have been informed, is that the Adept Brothers who were anxious to save the British power at that time, regarding it as a better government for India than any system of native rule that could take its place, were quick to distribute information by their own methods when this could operate to quiet popular excitement and discourage new risings."

—The Occult World by A, P. Sinnet, Eighth Edition, page 103.

অর্থাৎ দূরদেশে ইংরাজের অনুকূল কোন ঘটনা ঘটিলে কয়েক ক্ষেত্রে তাহার সংবাদ স্থানীয় শ্বেতাঙ্গগণের কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বেই বাজারে প্রচারিত হয়। সিনেট সাহেব জানিতে পারিয়াছেন যে, বর্ত্তমান উপদ্রবের প্রশমন ও নূতন উৎপাত নিবারণ উদ্দেশে উক্ত অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন মহাত্মাদের দ্বারা ঐরূপ কার্য্য সম্পাদিত হইত। তাঁহারা জানিতেন যে, তৎকালে ইংরাজহস্তে রাজ্যের ভার থাকাই শ্রেয় ছিল।

বেনারস বিজয়ের তখনকার কমিশনর

টাকার সাহেব সরকারী রিপোর্টেও প্রকাশ করেন :—"I do firmly believe that there is a special divine influence at work on men's minds to keep them quiet."—তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস যে, ঈশ্বর বিশেষভাবে প্রজাকুলের চিত্তের উপর ক্রিয়া-দ্বারা তাহাদিগকে শান্ত রাখিয়াছেন। সিপাহীযুদ্ধ-প্রণেতা কে সাহেবও লিখিয়াছেন,—"The good Providence battled for us on our side"—J. W. Kaye.—মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের দিকে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন।

বিপ্লবকালে যেমন অশিক্ষিত অসভ্য বর্ব্বর জ্ঞানধর্ম্ম বিবর্জ্জিত সমাজের নিম্নস্তরস্থ হিন্দেনগণ শ্বেতাঙ্গ নরনারীর প্রাণনাশ করতঃ আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, তদবসানে সুসভ্য সুশিক্ষিত জ্ঞানী ধার্ম্মিক মানব-সমাজের ভূষণ স্বরূপ খ্রীষ্টশিষ্য মহাত্মাগণ কেবলমাত্র প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করণোদ্দেশে দোষার সহিত বিস্তর নিরীহ বৃদ্ধবনিতা ও শিশু বধ করিয়া প্রীতি সম্ভোগ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। কেবলমাত্র এলাহাবাদে তিন মাস কাল ক্রমাগত নরবলি দিয়া ছয় হাজার প্রজাকে শুধু সন্দেহের উপর যমালয়ে প্রেরণ করা হয়। যাঁহারা এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তাঁহারা সগৌরবে প্রকাশ করিয়াছেন,—"spared no one." "peppering away at niggers enjoyed amazingly."

কর্ণেল নিকলসন অন্য একজন কর্ণেলকে তৎকালে যে পত্র লিখেন, তাহাতে প্রকাশ করেন :—"Let us propose a Bill for the flaying alive, impalement or burning of the murderers of our women and children. The idea of simply hanging the perpetrators of such atrocities is maddening."

ইহাকেই বলে ব্যাঘ্রবৃত্তি!

প্রঃ। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই লোমহর্ষণ কাণ্ডের মূলীভূত কারণ কি কেবল দাঁতে টোটা কাটাইবার হুকুমের আশঙ্কা?

উঃ। এতৎসম্বন্ধে একটা মোটা কথার খেয়াল করা হয় নাই। অনেকেরই ধারণা যে, উহা ঐ সামান্য কাল্পনিক কারণ ধরিয়া সংঘটিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা ঠিক নয়। সম্যক আলোচনার এখানে প্রয়োজন নাই, কেবল একটা কথা দেখা যাউক। ভোজপুর অঞ্চলের জগদীশপুর নামক স্থানের জমাদার বিখ্যাত কুঁওর সিংহ অস্ত্রধারণ করিয়া প্রথমটা একটু কারদানী প্রকাশ করায় উক্ত প্রদেশে এই ছড়াটী প্রচলিত হয় :—

"রাজা ভৈলে রজুলী দিওয়ান ভৈলে ধুনিয়া।
মারেলে কুঁওর সিংহ দলকলে দুনিয়া॥"

অর্থাৎ রাজা ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গ হীন-প্রকৃতির না হইলে রাজ্যে বিভ্রাট ঘটিতে পারে না, এইরূপ ঘটায় কুঁওর সিংহের প্রহারের চোটে দুনিয়া কম্পমান। বাস্তবিক রাজপুরুষগণের নৈতিক বল যতদিন সতেজ থাকে, ততদিন সহস্র উপদ্রবকারী একত্র হইলেও কিছুই করিতে পারে না। সাধারণ কথায় বলে, রাজার পাপ না হইলে রাজ্যে অমঙ্গল ঘটিতে পারে না। রাজা যদি নিষ্পাপ থাকিয়া লোভশূন্য হৃদয়ে নিক্তির তৌলে ন্যায়-বিচার দ্বারা রাজ্য শাসন করেন, কেবলমাত্র দুরভিসন্ধি চরিতার্থ হেতু কেহ তাঁহার কোনরূপ অতি সামান্য ক্ষতিও করিতে পারে না; আর অপর পক্ষে রাজার ধর্ম্মবলের যদি অভাব হইয়া পড়ে, বজ্রদণ্ডেও বিপ্লব আটকাইয়া রাখা যায় না। ইতিহাস ত এ বিষয়ে বারম্বার সাক্ষ্য দিয়াছে।

যাহা হউক, অনেক রাজাবিদ্রোহ [illegible]

বিধাতার মঙ্গল-বিধানে দেশে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হইল। কোম্পানির হাত হইতে সাম্রাজ্যের শাসনভার খোদ ইংলণ্ডেশ্বরী গ্রহণ করিলেন। সওদাগর সম্প্রদায়ের কার্য্যকলাপের তদারক মাত্র এতদিন বৃটিশ পার্লামেন্টের হস্তে ন্যস্ত ছিল, এখন হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহারাই ভারতের রাজ-রাজেশ্বর হইলেন। সব গোল মিটিল, কিন্তু ফলে কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা এই অর্দ্ধ শতাব্দীকাল সাক্ষ্য দিবে।

সিপাহীযুদ্ধে বেশ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের দ্বারা ওভাবে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব বলিলে সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ করা হয় না। তবে ইহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, রাজা প্রজা উভয়কে আক্কেল দিবার জন্য ঐ বিভীষণ ব্যাপারের অভিনয় আবশ্যক হইয়াছিল। সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সমস্তই মঙ্গলের জন্য, মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কি প্রকারে সম্ভবে? কোম্পানির অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া সিপাহীরা ক্ষেপিয়াছিল, তাহাও ঠিক, সাম্রাজ্যময় ঘোর বিপ্লব ঘটিল, তাহাও ঠিক, আবার তুমুল সংগ্রামের পর শান্তি পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাও ঠিক। নানা শ্রেণীর কত দোষী নির্দ্দোষী শ্বেতাঙ্গের ও কৃষ্ণাঙ্গের শোণিতে ধরণী কলঙ্কিত হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু মোটের উপর সংসারের কল্যাণ বৈ অকল্যাণ হয় নাই, ইহা নিশ্চয়। সমগ্র বিশ্বের ইষ্টের দিকে সকলে ধাবিত। আমাদের দৃষ্টি অতি ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ, তাই একদেশদর্শিতা হেতু আমরা বিশেষ বিশেষ স্থলে অশুভের লক্ষণ দেখিয়া ক্ষুণ্ণ ও চিন্তিত হৃদয়ে নানারূপ বিলাপ করিয়া থাকি। আবার ওটাও আমাদের ব্যক্তিগত বিকাশা-নুযায়ী ঠিক, কুত্রাপি অসঙ্গতি নাই। সুবিখ্যাত ফরাসীবিপ্লবের কথা বোধ হয় জান, কি ভয়ঙ্কর ঘটনাবলী দ্বারা উহার কলেবর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ভাবিলে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। ঐ শ্রেণীর লোমহর্ষণ কাণ্ড সংসার আর একটী দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। কি ভয়ানক রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া ফরাসী রাজ্য ভাসাইয়া দেয়। সমসাময়িক কত মনীষী উহার তীব্র সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু এখন লোকে বিলক্ষণ বুঝিতেছে, উহা দ্বারা সমস্ত ইউরোপের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সভ্য জগতের কি পরিমাণে উপকার সাধিত হইয়াছে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে উহার শতবার্ষিক উৎসবোপলক্ষে পারিস নগরে একটী বিরাট প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার অন্তর্গত সহস্র সহস্র দৃশ্যের মধ্যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাস্তীলধ্বংসের * জীবন্ত অভিনয় অন্যতম। সেই সময়ের সর্ব্ববিধ অবস্থায় অনুরূপ রাস্তা পথ, ঘর দুয়ার, দোকান পাট প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত একটী নকল পল্লী ও তন্মধ্যস্থ বাস্তীলগৃহ এবং তাৎকালিক আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ ঠিকঠাক বজায় রাখিয়া অন্যান্য ব্যাপার প্রদর্শিত হইয়াছিল। তথায় প্রত্যহ বৈকালে কারাগার ধ্বংসকালীন যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত পর্য্যায়-ক্রমে প্রত্যক্ষ কার্য্য দ্বারা অভিনয় করা হইত। একদিন আমাদের সঙ্গে দুইটী ফরাসী মহিলা ছিলেন, অভিনয়ান্তে একটু দুঃখের সহিত হৃদ্বিদারক দৃশ্য সমূহের কথা উল্লেখ করায় তাঁহারা একটু বিস্মিত হইয়া, অথচ আহ্লাদের সহিত, বারম্বার বলিতে লাগিলেন।—"ঐ বিপ্লব না ঘটিলে আমরা কখনই এত উন্নতি লাভে সক্ষম হইতাম না,

* Bastille নামক রাজনৈতিক কারাগার।

এবং আজ এখানে আপনার মত সুদূর দেশবাসী প্রাচ্য ভদ্রলোকের সহিত একত্রে দাঁড়াইয়া এই আমোদ উপভোগ করিতে পাইতাম না।"

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। সংক্ষেপে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, "সুপ্রতিষ্ঠ ধাতার বিধান," যখন যেখানে যাহা ঘটিতেছে, বাহ্যিক ভাব যেমনই হউক, তাহাই উত্তম ও নিতান্ত উপযোগী, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের এ বিশ্বে আদৌ স্থান নাই। তোমার একটী পুত্র হইল, তুমি আনন্দে বিভোর, অতি সুন্দর; আবার সেই পুত্র কিছু দিন পরে তোমাকে অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া কালের গ্রাসে পড়িল, তাহাও অতি সুন্দর। আগুনে পুড়িয়া সোণার যেমন নির্ম্মলকান্তি উজ্জ্বল বর্ণ হয়, আমরা, তেমনি, ঘোর দুঃখ বিপদের ভিতর দিয়া আসিয়া পবিত্রতা লাভ করতঃ সকল কল্যাণের আকর ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইয়া থাকি। অধুনা এই যে রাজ্যময় ঘোর অশান্তি উপদ্রবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কত লোকের কারাবাস দ্বীপান্তর ইত্যাদি হইতেছে, ইহাও নিশ্চয় আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত; ভবিষ্যতে সুফল প্রদান করিবার জন্যই এবম্বিধ আপাত দুঃখজনক ব্যাপার সমূহের অবতারণা। সুকোমল পুষ্প শয্যায় সুখে ঘুমাইতে ঘুমাইতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারা বিধাতার ব্যবস্থায় লেখা নাই। উন্নতির পথ চিরকাল কণ্টকাকীর্ণ।

প্রঃ। এই যে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী নামে দুই দল হইয়াছে, ইহাদের সম্বন্ধে কি বলেন?

উঃ। উহারা উভয়েই ভাঙ্গা গাঁয়ের মোড়লীর জন্য বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত। একটা গল্প শুনা যায়, বড়বাজারের পথে দুই ব্যক্তি "হীরালাল শীলের টাকা বেশী, কি শ্যাম মল্লিকের টাকা বেশী?"—এই তর্কে উপনীত হইয়া শেষে ঘোর বিতণ্ডা, মারামারি, ঘুসাঘুসি, রক্তারক্তি; তার পর উভয়ে গেরেপ্তার হইয়া পুলিশ কোর্টে হাজির। ইহাদেরও দশা তাই হইবে;—"এলো শ্রাদ্ধের গুতো দক্ষিণা।" এক পক্ষ বলিতেছেন, "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন" লাভের জন্য চেষ্টা করাই উচিত; অপরের দাবী "নিভাঁজ স্বরাজ।" এই দুইয়ের কোন্‌টা যে কে দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহা ত জানিনা। উভয়েরই উদ্দেশ্যের সবল ব্যাখ্যা,—বৃটিশ সিংহকে বক্তা প্রদর্শন। আমরা শশক হইয়া পশুরাজকে একদম্ বোকা বুঝাইয়া তাঁহার হাত হইতে কাননের প্রভুত্ব কাড়িয়া লইব, এ কিরূপ দুরাশা! তবে—

'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য অবোধস্য কুতোবলং
পশুসিংহ বনে রাজা শশকেন নিপাতিতঃ।'

পঞ্চতন্ত্রের ক্ষুদ্রকায় হীনশক্তি শশক যেমন ভীমপরাক্রম বিশালবপু মৃগেন্দ্রকে কেবলমাত্র বুদ্ধিবলে পরাভব করতঃ অনায়াসে সমনসদনে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তেমনটী পারিলে মন্দ নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্র কোথায়?

মধ্যপন্থীরা বলেন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতির মত নামে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকিয়া আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী আপনাদের দেশ আপনারা শাসন করিব; অপর দলের কথা,—ওটুকু সংশ্রব আবার কিসের জন্য? আমেরিকার মত স্বাধীনতা না পাইলে চলিবে না:—একদম্ আঙুল ফুলে কলাগাছ! ইহাঁদের পায়ে ধরিয়া বলি,—আরে ভাই!

একটা কথার মারপেঁচ লইয়া আপনাদের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া বৃথা বলক্ষয় কর কেন? এই শক্তি সঞ্চয়ের সময় এক কাঁচ্চা বলই বা কি জন্য অনর্থক নষ্ট হয়? কোন প্রকারে যদি কানাডাদির মত স্বাতন্ত্র্য হাসিল করিতে পার, তার পর বাকীটুকু পাইতে মোটেই বেগ পাইতে হইবে না। লক্ষ টাকা জমা করিতে পারা একটি দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু একবার একলাখ টাকা হাতে হইলে তখন সামান্য যত্নেই হুহু করিয়া দশ বিশ লক্ষ আসিয়া পড়ে। চরমপন্থীদের আর এক কথা বিবেচনা করা উচিত যে, মধ্যপন্থীদের মনে কি আদৌ সাধ হয় না যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা পৃথিবীর মধ্যে একটা গণ্য মান্য জাতি হইয়া একবার বক্ষ ফুলাইয়া দাঁড়াই? বাস্তব কি ইচ্ছা হয় না যে, চিৎ হইয়া শয়ন করে? কিন্তু কি করিবে, কুঁজে যে ঠেকে।

প্রঃ। কোন গণ্য মান্য ব্যক্তি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের আয়োজন চলিতেছে; সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বচ্ছন্দতা, স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা লোকের, উহা আত্মবিস্মৃতিজনিত আত্মহত্যা।

উঃ। গার্হস্থ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক, মানসিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ স্বাধীনতার মধ্যে কোন একটা বাদ দিয়া যে মনুষ্যত্বের পথে দাঁড়াইতে পারা যায়, ইহা এই প্রথম শুনিলাম। শাস্ত্রে প্রচারিত,—"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং; সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।" কোন না কোন প্রকার পরাধীনতা পরবশতা ভিন্ন অশান্তি দুঃখ আসিতে পারে না। আন্তরিক ষড়রিপুর অধীনতায় মানুষ যেমন কষ্ট পাইয়া ক্রমে হীন হইয়া পড়ে, বাহিরের লোকের অত্যাচার উৎপীড়নের চাপেও দুঃখ ভোগ করিতে করিতে তেমনি অপদার্থ হইতে থাকে। কোন ব্যক্তির দাপটে নিজের ঘরে নিজে চোরের মত থাকা যেমন নরক ভোগ, নিজের দেশে তেমনি পরাধীনতার পেষণে কাল্যাতিপাত দারুণ যন্ত্রণার কারণ। কোন হেতুবশত সর্ব্বদা সঙ্কুচিত অবস্থায় জড়সড় থাকিলে যে সঙ্কোচন বৈ প্রসারণের আশা নাই, ইহা ত অতি পুরাতন সত্য।

"ধীরে ধীরে যাই ফিরে ফিরে চাই,

ভাবটা কি মনুষ্যত্ব বিকাশের পূর্ব্বভাস? মুখ ফুটিয়া প্রাণের গভীর বেদনা জানাইতে যাওয়া যেখানে ঘোরতর অপরাধের মধ্যে গণ্য, সেখানে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ত দূরের কথা, উহার বীজ পর্য্যন্ত যে মারা যাইতে বসিয়াছে, ইহাও কি এখন খুলিয়া বলিতে হইবে? পিষ্ট পতিত অবস্থায় কোণঠেশা হইয়া ভিক্ষাবিহারীর মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকাকে "আত্মহত্যা" ... "আত্মহত্যা" কেন বলা হয় না। উহার প্রতিকার চেষ্টাকে উক্ত আখ্যা দেওয়া যায়, ইহার মীমাংসা তোমরা কর, আমি আর কি বলিব! অক্ষমতা হেতু পড়িয়া মার খাইতেছি, মুখে রা নাই, অথচ মনে মনে প্রহারকের চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করিতেছি, অপরদিকে প্রভুত শক্তি থাকা সত্ত্বেও অত্যাচারীর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহার অপরাধ উপেক্ষা করিতেছি, উপরন্তু তাহার আত্মার কল্যাণকামনায় ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতেছি। জিজ্ঞাসা করি, ইহার কোন্‌টা সংস্কৃত নামের যোগ্য। যে সদ্‌গুণ মনুষ্যত্ববিকাশের একটা প্রধান উপকরণ, ঐ দুই শ্রেণীর কোন্‌টায় আমাদের স্থান, বল দেখি?

এই দুর্দিনে যাঁহারা উক্তরূপ বাক্যবিন্যাস দ্বারা সকল দিক বজায় রাখিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহারা সুখের পায়রা, দুঃখের ধার দিয়া যাইতে পারেন না; জনকতক মুষ্টিমেয় সম্পন্ন ভাগ্যবান ব্যক্তি ব্যতীত ভারতের আপামর-সাধারণ যে বর্ত্তমান শাসন-নীতির অধীনে খাবি খাইতেছে, প্রাণপাখী অন্নাভাবে কখন্ দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া পলায়, তাহার ঠিক নাই, এ সংবাদ তাহারা রাখিয়াও রাখেন না। মহাত্মা কবীর গাইয়াছেন :—

"দুঃখী পড়ে পাহাড়তল কোই না খবর লিন্।
সুখীকা যো কাঁটগড়ে সবকোই হায় হায় কি।"

গরিব পাহাড়চাপা পড়িলেও কেহ তাহার খোজখবর লয় না, আর ধনীর অঙ্গে একটা সামান্য কাঁটা ফুটিলেই দেশশুদ্ধ লোক "হায়! হায়!" করিয়া ছুটিয়া বেড়ায়; সংসারের এই নিয়ম।

সাম্রাজ্যের সর্ব্ববিধ দুর্দ্দশার বিষয় যাঁহারা প্রাণের সহিত নিয়ত চিন্তা করিয়া থাকেন,

দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের ভাব কমাইতে চেষ্টা পান, হৃদয়ের তপ্ত শোণিত দিয়া যাঁহারা মায়ের পায়ে আল্‌তা পরাইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, কেবল মাত্র সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণ এই তুমুল তুফানে হা'লে বসিবার অধিকারী; আর যাঁহারা কেবল ভে'টেল গাঙ্গে সুবা-তাসে পা'লতোলা নৌকায় আগ্রহসহকারে কর্ণধারের পদগ্রহণে অগ্রসর, ঝড়ঝাপটের সময় তীরে দাঁড়াইয়া ঢেউ গণিতে বাহাদুর, জলের ধারেও যাইতে সাহস করেন না, তাঁহাদের ডাঙ্গার মাঝিগিরি এ সময়ে বিকায় না।

প্রঃ। ভাবের মত্ততায় কি কোন কাজ হইয়া থাকে?

উঃ। নিশ্চয়। নিশ্চয়। নিশ্চয়। ভাবের তেজ ভিন্ন কোথাও কোন বড় কাজ হয় নাই। ভাব ত চিন্তাপ্রসূত, তীব্রচিন্তা-দ্বারাই গভীর ভাবের জন্ম হইয়া থাকে। আগে ভাব না থাকিলে কাজ কিসের উপর হইবে? ঈশ্বরের কল্পনা বা ভাবাই ত সৃষ্টিকার্য্যের মূলে একমাত্র কারণরূপে বিদ্যমান। বহুজন দ্বারা কোন কাজ করাইতে হইলে আগে তাহাদের মধ্যে ভাব ছড়াইয়া দেওয়া নিতান্ত দরকার। ভাবই ত আসল জিনিস। চিন্তাশক্তির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, এখন একটু ভাল করিয়া বলা যাউক। ইংরাজী দলীল দেখাইলে হয়ত ভাল বুঝিতে পারিবে। আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কি বলিতেছেন, শুন;—

'Thought is not, as is many times supposed, a mere indefinite abstraction, or something of a like nature. It is, on the contrary, a vital, living force, the most vital, subtle and irresistible force there is in the universe. In our very laboratory experiments we are demonstrating the fact that thoughts are forces. They have form, and quality, and substance, and power, and we are beginning to find that there is what we may term a science of thought. We are beginning also to find that through the instrumentality of our thought-forces we have creative power, not merely in a figurative sense, but creative power in reality"—R. W Trine.

অর্থাৎ চিন্তা একটা অনিবার্য্য সূক্ষ্ম জীবন্ত শক্তি, যাহার নিকট বিশ্বের আর সব শক্তি নতশির। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগারে পরীক্ষিত হইয়াছে যে, উহার মূর্ত্তি আছে এবং সূক্ষ্ম-জগতের বিপুলশক্তি উহাতে বিদ্যমান, ইহাও ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে যে, বাস্তবিক উহার সৃষ্টিশক্তি আছে।

প্রাগুক্ত সিনেট সাহেবও একস্থলে বলিয়াছেন—'The human brain is an exhaustless generator of the most refined quality of cosmic force out of the low, brute energy of Nature." A. P. Sinnet.

অর্থাৎ প্রকৃতির স্থূল জড় পরাক্রম হইতে অতি উচ্চশ্রেণীর বৈশ্বশক্তি উদ্ভব করিবার জন্য মানবমস্তিষ্ক একটী অনন্ত প্রস্রবণ।

এখন 'ভাবের মত্ততা" কথাটা দেখা যাউক। যাঁহারা বলেন, "ভাবের মত্ততায় কোন কাজ হয় না" তাঁহারা যদি উহাকে কৃত্রিম একটা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র বোধ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা; পরন্তু প্রকৃত ভাবের খাঁটি মত্ততা বড় শক্ত জিনিস। হৃদয়ের সরল প্রেমাবেগের একটু বেশী মাত্রাকে যদি ভাবের মত্ততা বলা যায়, তাহা হইলে উহা ত স্বর্গের সামগ্রী। পৃথিবীর ইতিহাসখানার পাতা উল্টাইয়া দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক বড় কাজ যাহার দ্বারা অসাধ্যসাধন হইয়া জগৎকে চমকিত করিয়াছে, তাহার মূলে ভাবের মত্ততা। তবে কি জান, যে মত্ততা হইতে অসমসাহসিকতা জন্মগ্রহণ করতঃ দুরূহ কার্য্যসমূহ সম্পাদন দ্বারা সংসারের কল্যাণ-সাধন করে, তাহাকে লোকে অসাধারণ বীরত্ব নাম দিয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত তাহার পূজা করিয়া থাকে; আবার তাহাই বিফলপ্রদ হইলে অবিবেচনা, হঠকারিতা, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-শূন্যতা বলিয়া তীব্রনিন্দার বিষয় হয়। পদার্থ একই, কেবল ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনানুযায়ী কখন কিরীট-শোভিত শিরে সিংহাসনাভিষিক্ত, কখন ভূলিণ্ঠিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত, বা চরমক্ষেত্রে পৃথিবী হইতে নরহত্যার ন্যায় অপসারিত। একটা সাধারণ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করি

—গৃহদাহে হুহু করিয়া চারিদিকে বেড়া-আগুন জ্বলিতেছে, তন্মধ্যস্থ একটী পিতৃমাতৃ-হীন শিশুকে বাহির করিতে হইবে। কাতারে-কাতার দাঁড়াইয়া শিশুর আসন্ন-মৃত্যুর বিষয় আলোচনা করতঃ আহা! আহা! করিতেছে, পরন্তু কাহারও সাহসে কুলায় না, অগ্নি হইতে তাহাকে বাহির করিবার চেষ্টা করে। ভিড়ের ভিতর জনৈক যুবা চকিতের ন্যায় ভাবিল—বিপন্ন শিশুর পিতামাতা এখানে বর্ত্তমান থাকিলে, তাহারা নিশ্চয় স্নেহের দুর্দ্দমনীয় আবেগে নিজজীবন আহুতি দিয়াও সন্তানকে বাঁচাইবার জন্য ছুটিত, কিন্তু তদভাবে আমরা এত লোক থাকিতে কি শিশুটী বেঘোরে মারা যাইবে? এই ভাবের মত্ততায় যুবক আপনাকে ভুলিল, শিশুর বিপদে নিজে ডুবিল, প্রেমের অনিবার্য্য ব্যাকুলতায় অনল-শিখার পরাক্রম তুচ্ছ গণিয়া হুতাশনে ঝাঁপ দিতে তিলমাত্র দ্বিধা করিল না। এখনও উপস্থিত দর্শকবৃন্দ উহার দুর্জ্জয় সাহসের কোনরূপ সমালোচনা করে নাই, তাহার কাণ্ড দেখিয়া হতবুদ্ধি অবস্থায় নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান, কেবল অবাক্ হইয়া ভাবিতেছে, লোকটা করিল কি। পরে ফলাফল অনুসারে উক্ত কার্য্যের স্তুতিনিন্দা হইবে। যদি জীবিত-শিশুসহ অক্ষতশরীরে এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হয়, ধন্য! ধন্য! যশ তাহার ভাগ্যে; যদি নিজে দগ্ধ হইয়া শিশুকে বাচাইয়া থাকে, প্রতিষ্ঠা ততোধিক; যদি শিশুকে রক্ষা করিয়া আপনি অগ্নিক্ষতে মারা যায়, বহুকালের জন্য তাহার গুণকীর্ত্তন চলিবে, আর যদি হুতাশন উভয়কেই গ্রাস করিয়া ফেলে, তখন সাধারণ লোকে একমুখে বলিবে,—লোকটার কাজ ভাল হয় নাই, দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া গোঁয়ারের মত প্রাণটা হারাইয়া ঘোর মূর্খতা প্রকাশ করিয়াছে। পরন্তু বিধাতার খাতার অন্যরূপ হিসাব, তাহাতে ফলাফলের বিচার না করিয়া কেবলমাত্র উদ্দেশ্যের পবিত্রতানুযায়ী জমাখরচ হইবে। সাংসারিক ব্যবস্থা স্বতন্ত্র, লাভালাভ ফলাফল গণনা করিয়া যে কায করা হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা শাসিত হুনিয়া তাহাকেই হিসাবী কাজ বিবেচনার কাজ বলিয়া প্রশংসা করে; অর্থাৎ গড্ডলিকাপ্রবাহে যাহারা কলুর বলদের মত চক্ষু বুজিয়া চলিয়া থাকে, তাহাদিগকেই আসল কাজের লোক বলে, আর যাহারা কোনরূপ উচ্চ আশায় সাধারণের অনুমোদিত চিরাগত প্রণালীর বাহিরে গিয়া পড়ে, বিফল-মনোরথ হইলে তাহাদিগকে বেকুব, বেহেড, মত্ত, পাগল বলিয়া নিন্দা করিতে ছাড়ে না।

প্রঃ। যদি কেহ বলেন যে, ফল অনিশ্চিত হইলে লোক সমষ্টিকে বিপদে ফেলিবার কোন ব্যক্তিবিশেষের অধিকার নাই; সুতরাং ধীর স্থিরভাবে বিধাতার বিধানের অপেক্ষায় থাকা উচিত। এ কথার কি কোন উত্তর আছে?

উঃ। কোন্‌টা বিপদ কোন্‌টা সম্পদ, তাহার বিচার করা আমাদের পক্ষে কঠিন। যাহাকে আমরা বিপদ বলি, তাহা যে ঈশ্বরের চক্ষে সম্পদের কারণ নহে, তাহা কি মানুষ বলিতে পারে? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিপদ সম্পদ বলিয়া কোন জিনিস বিধাতার তালিকায় নাই, সবই শুভ ফলপ্রদ বলিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং বিপদের বিভীষিকা ভাবিয়া এত ব্যাকুলতা কেন? ওরূপ প্রলাপবাক্য দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত ভোগবিলাসীর বিকারের ফল বুঝিতে হইবে। পাছে তাহার ও তাঁহার দলের লোকের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইয়া তথাকথিত আরামের ব্যাঘাত হয়, একারণ দেশ রসাতলে গেলেও সকলের হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকাই কর্ত্তব্য! দুনিয়া ডুবলে সহাদেব একহাঁটু জল। ইহার পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই এ প্রশ্নের সমাধান উত্তর হইয়া গিয়াছে। এবম্বিধ ঘোর দুর্দ্দিনের মধ্যেও যাঁহারা দাসদাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতে সক্ষম, তাঁহারা আপন সম্পদের নেশায় মাতোয়ারা হইয়া আছেন, পরের দুঃখ ক্লেশের কথা ভাবিবার তাঁহাদের শক্তি বা অবকাশ কোথায়? আর থাকিলেই বা কেন অনর্থক সে কথা লইয়া মাথা বকাইবেন? কি গরজ পড়িয়াছে? তবে সস্তায় দু'চারিটা লম্বা বাত্ বাতলাইতে ছাড়েন না, ইহাতেই দুঃখ হয়। চারিদিকের দীনদুঃখী কৃষকের জীবগণ মরিলে তাঁহাদের ক্ষতি কিসের, যদি প্রত্যহ ক্ষীরের বাটি নিয়মিতরূপে তাঁহাদের সুকোমল বদনে পঁহুছিবার কোন বিঘ্ন না ঘটে?

কোন ঝুঁকিতে না গিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া বিধাতার বিধানের অপেক্ষায় থাকা বা থাকিতে বলা অলস নিকম্মা ব্যক্তির কাজ। তজ্জন্য এতদিন প্রতীক্ষা করিয়া যে বিধান নামিয়াছে, তাহার জ্বালায় যে আমরা অস্থির, এ কথার জবাব কি? বাবুরা ত বেশ স্ফূর্ত্তিতে ছুড়ি হাঁকাইয়া গড়ের মাঠে হাওয়া খাইয়া ফিরিতেছেন, কিন্তু আমরা যে প্লেগে, দুর্ভিক্ষে, জল-কষ্টে, ম্যালেরিয়াতে ছট্‌ফট্ করিয়া কণ্ঠাগত-প্রাণ হইয়াছি, তাহার করি কি? ইহা অপেক্ষা যে তোপে উড়িয়া যাওয়া সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়। এ বিপদের অপেক্ষা কি বিশ্বে আর কোন বিপদ আছে যে, তাহার জন্য বাবুদের এত ভাবনা? ধন্য! এরূপ মহাত্মা-গণের "স্বদেশ-প্রেম," ধন্য! ইহাঁদের "তত্ত্ব প্রচার।" ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায়, রোগের যন্ত্রণায় এ যাবত কত না চীৎকার করিলাম, কেহ শুনিল না। হায়! হায়! এমন বিপদ কি পৃথিবীতে কখন কাহারও হইয়াছে বা হইতে পারে যে এতদপেক্ষা বিপদের আশ-ঙ্কায় বাবুরা বিচলিত।

এইখানে মহাত্মা বাল গঙ্গাধর তিলকের শেষ উক্তির আলোচনা করিলে দোষ হয় না, বরং বিপদ-সম্পদের কথা খুলিবে। জজ ডাবার কর্ত্তৃক দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে তিলক যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের সকলেরই সাধনার মন্ত্র হওয়া উচিত। যেহেতুক ওরূপ বিষম বিপদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি যেরূপ অকুতোভয়ে নিজের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাধারণ জীবের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, সে সময় তাঁহার হৃদয়ে সাক্ষাৎ ভগবান আবির্ভূত হইয়া তাহাতে বল সঞ্চার না করিলে ওরূপ ক্ষেত্রে অমন মহাবীরোচিত বাক্য তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারিত না। প্রত্যেক শব্দ হইতে যেন মুক্তা ঝরিতেছে:—

"There are higher powers that rule the destinies of men and nations and it may be that the cause I represent may he benefited more by my sufferings than by my freedom."

অর্থাৎ মানব শক্তি অপেক্ষা মহোচ্চতর শক্তি সমূহ (দেবতারা) ব্যক্তিবর্গ ও জাতি সমূহের ভাগ্যবিধাতা, সুতরাং ইহা সম্ভব যে, আমার স্বাধীনতা অপেক্ষা কারা-যন্ত্রণা দ্বারা দেশের কল্যাণ সুন্দরতর রূপে সাধিত হইবে।

আমাদের সকলেরই দোষ ত্রুটি আছে, তিলকেরও আছে, পরন্তু তিলকে যে বিস্তর মহাপুরুষোচিত লক্ষণ বিদ্যমান, শত্রুমিত্র সবাই দেখিতেছেন। ধন্য ভাই তিলক! তোমাকে বারম্বার প্রণাম।

প্র.। রাজার দ্বারা কি আমাদের দুঃখ ঘুচিতে পারে না?

উ। নিশ্চয়। কিন্তু এ যুগের রাজারা ত সব ঢোঁড়া, তাঁহাদিগকে এক একটা সাপের মত সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়া মন্ত্রী মহাশয়েরাই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। সচিববর্গ আবার তাঁহাদের দলের প্রজাবর্গের মুখাপেক্ষী; কাজেই ঐ সকল ক্ষমতাপন্ন প্রজাদের না মনে করিলে রাজ্যের কোন প্রকার উন্নতি সম্ভবে না। ইংলণ্ডের প্রজারা সর্ব্বত্র ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের ভার-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের কৃপা ভিন্ন আমাদের কল্যাণের আশা কোথায়? এখন কথা হইতেছে এই যে, ইউরোপীয় সভ্যতাতে ঘোর স্বার্থপরতা দোষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা ভয়ানক ইহসর্ব্বস্ব-বাদী হইয়াছে, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করাই উহাদের পরম পুরুষার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রে বলে:—

কুরঙ্গ মাতঙ্গ পতঙ্গ ভৃঙ্গ,
মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাথী স কথং ন হন্যতে,
যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥

—শব্দ বা স্বরের দ্বারা কর্ণসুখ সম্পাদন করিতে গিয়া হরিণ মারা যায়; স্পর্শ-সুখ দ্বারা স্বীয় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হেতু গজরাজ বন্দী হইয়া থাকে, রূপের মোহে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের প্রাণ বিনষ্ট হয়, কেতকীর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমর কণ্ঠকবিদ্ধ হয়, আহারের লোভে মৎস্য জীবন হারায়। যখন একটা ইন্দ্রিয়ের বশ্যতা এক এক জন্তুর সমূহ বিপদের কারণ হইয়া থাকে, তখন পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস মানুষের কি না দুর্দ্দশার কথা। আবার, তদপেক্ষা ভয়ঙ্কর অবস্থা ইউরোপীয় সুসভ্য জীবগণের, কারণ তাঁহারা অধুনা এক [illegible]

সব কয়টী ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতে তৎপর হইয়াছেন। অন্যান্য দেশের লোকে পৃথক্ পৃথক্ সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে নিযুক্ত থাকেন, কিন্তু ইউরোপীয়গণ, বিশেষ ইংরাজ জাতি, এক ভোজের সময় সব ইন্দ্রিয় গুলির শৃঙ্খল গলায় পরিয়া মোহানন্দ উপভোগে যত্নবান। এক দিকে স্ত্রীপুরুষের সংঘর্ষণ-সুখঅনুভব করা হইতেছে; অপর দিকে ব্যাণ্ডবাদ্যে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছেন, তৃতীয়ে ভোজন প্রকোষ্ঠের ও টেবিলের সাজ সজ্জাদির সহিত লেডিদের বদনকমলের রূপ-মাধুরীর ও অঙ্গসৌষ্ঠবের রমণীয়তার এবং পোষাকপরিচ্ছদের পারিপাট্যের বাহার সন্দর্শনে নয়নযুগল প্রীতিলাভ করিতেছে, চতুর্থে টেবিলোপরি শোভামান পুষ্পগুচ্ছ-সমূহ-নিঃসৃত সৌরভ সহ সাহেব-মেমের সুগন্ধিসিক্ত রুমালাদির সুঘ্রাণ লইয়া নাসিকা উৎফুল্ল হইতেছে; অবশেষে পঞ্চমে উঠিয়া চরম ব্যাপার, প্রহরেক কাল ধরিয়া শতাবধি প্রকারের ভোজ্যপানীয় গলাধঃকরণ দ্বারা রসনা আহ্লাদে আটখানা হইয়া নৃত্য করিতেছে। বুঝিয়া দেখ, কি কারখানা। সাক্ষাৎ কলিপ্রভুর খাশ বাজত্ব আর কোথায়। যাহাদের দেহাত্মবোধ এত প্রবল, তাহাদের নিকট জ্ঞানধর্ম্মের আশা করা কি বাতুলতা নয়? আর জ্ঞানধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত বিবেকবিহীন জীবের হৃদয়ে দয়াদাক্ষিণ্যাদি কি প্রকারে তিষ্ঠিতে পারে? এরূপক্ষেত্রে পাপজনক লোভ ও পাপজননী হিংসার সেবক হইয়া ইহারা যে পরস্বাপহরণ ও পরপীড়নে সুখানুভব করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? এবম্বিধ শ্রেণীর নরাকার জীব রাজাই হউন, রাজপুরুষই হউন, আর রাজজাতীয় সাধারণ মনুষ্যই হউন, সব এক ক্ষুরে মস্তক-মুণ্ডিত এক একটী স্বার্থপরতার অবতাররূপে বিরাজমান।

প্রাচীন ভারতের রামচন্দ্র প্রমুখ নৃপতিগণ যেরূপ ধর্ম্মের, ন্যায়ের, প্রজারঞ্জনের মূর্ত্তিস্বরূপ হইয়া অষ্টপ্রহর প্রকৃতিবর্গের হিতচিন্তা ও কল্যাণ-সাধনে রত থাকিতেন, তদ্রূপ কি পৃথিবী আবার কখন দেখিবে? ভগবানই জানেন। ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মোহমদের অদ্ভুত প্রভাব বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়, [illegible] পারেন কি না সন্দেহ। সর্ব্বসংহারক কালের প্রতাপে কোথায় আজ হিরণ্যকশিপু-রাবণ-কংস, কৌরব-পাণ্ডব-যাদব, মিসর-গ্রীস-রোম, ক্ষেরো-আলেকজাণ্ডার-সিজার ভাসিয়া গিয়াছেন, এ কথা তাঁহাদের মাথায় কুড়া'ল মারিয়াও বসান কঠিন। রাজশক্তির মূল যে কেবলমাত্র প্রজাকুলের সম্যক্‌রূপ লালনপালন, ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত বিধাতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত, প্রজা যে রাজার যথেচ্ছ ব্যবহারের সামগ্রী নয়, রাজার বা রাজপুরুষদের সুখস্বচ্ছন্দতার উপকরণাদি জোগাইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, এই সনাতন তথ্য তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত; নতুবা—আজ অমুক রাজ্যের নরপতি উৎপীড়িত প্রজা কর্ত্তৃক নিহত, কা'ল অমুক রাজমহিষী আততায়ী হস্তে নিধনপ্রাপ্ত, পরশ্ব বিদ্রোহী দ্বারা অমুক দেশের শাসনকর্ত্তার প্রাণ বিনষ্ট,—এবম্বিধ হৃদ্বিদারক সংবাদে পাশ্চাত্য জগৎ বিপর্য্যস্ত হইত না। যতদিন না রাজশক্তি কর্ত্তৃক নীতিবন্ধন লঙ্ঘিত না হয়, নির্ব্বিশেষে সকল জাতীয় সর্ব্বশ্রেণীর প্রজার প্রতি ন্যায়দণ্ড প্রসারিত থাকে অন্নবস্ত্রের অনাটনে দরিদ্রগণের দারুণ কষ্ট না হয় এবং যদি কখন হয়, রাজপুরুষগণ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকারের সম্যক প্রয়াস পা'ন, ততদিন কিছুতেই রাজ্যমধ্যে অসন্তোষ অশান্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে না, ইহা নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়! ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লিটন বাহাদুর যথার্থই বলিয়াছিলেন;—

"A single act of injustice in India is more damaging to the British Raj than a terrible defeat in a battlefield in Asia."—ভারতে একটী অবিচারের কার্য্য হইতে বৃটিশরাজের যত ক্ষতি হয়, এশিয়া খণ্ডের সমরক্ষেত্রে কোন যুদ্ধে ভয়ঙ্কর পরাভব দ্বারা তত ক্ষতি হয় না। বাস্তবিক পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর সতীত্ব ও রাজার ন্যায়, তিন জনের এই তিনটী গুণ অগ্নির দাহিকাশক্তির মত সঙ্গে সঙ্গে গাঁথা, তদভাবে প্রত্যেকের কোনই মূল্য নাই।

এখন বিচার করিয়া দেখা যাউক যে, ইংলণ্ডের প্রজাশক্তি যাহা বর্ত্তমানে সম্রাট-শক্তির প্রাণ বলিলেই চলে, তদ্দ্বারা আমাদের কোন উপকারের সম্ভাবনা আছে কিনা। প্রজাসাধারণ বলে যে, ভারতের রক্ষ-

শোষণে তাহাদের ত কোনই লাভ নাই, কেবলমাত্র ইংলণ্ডের ধনীদিগেরই ধন বাড়িতেছে। যে কার্য্যে তাহাদের স্বার্থ নাই, তাহা নিবারণ করিতে তাহারা একদিন বদ্ধপরিকর হইতে পারে, যদি তাহাদিগকে কেহ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে। ধনবানদিগের নিকট, পদস্থ ব্যক্তিগণের নিকট, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের নিকট আমি ত কোন আশা দেখি না। তবে ঐ এক আশায় বুক বাঁধিয়া যদি ভারতবাসী আরও কিছুদিন জীবিত থাকিতে পারে।

প্রঃ। ইংলণ্ডের শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ে কি এখন ভাল লোকের একেবারেই অভাব হইয়াছে?

উঃ। "উহা কখন কোন দেশে হইতে পারে না, তাহা হইলে সেখানে আর চন্দ্রসূর্য্য উঠিবে না। "সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকাঃ উত্তমাধমমধ্যমাঃ।" তবে কি না ভাল লোকের সংখ্যা কোথাও কম, কোথাও বেশী। ইংলণ্ডে আগে বিস্তর ভাল লোক ছিলেন, এখন তত নাই। ধনবানগণ সর্ব্বত্রই অধিকাংশ হীনমতি, পদস্থ ব্যক্তিরা সকল দেশেই সর্ব্বদা একটা বিশেষ স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া সব কাজ করেন. কেবল স্বাধীনচেতা নিরপেক্ষ কতকগুলি পণ্ডিত ব্যক্তিই ভরসাস্থল হইয়া সাধারণের স্বার্থ রক্ষা করিতে যত্নবান থাকেন, তাঁহাদের দ্বারা দেশের যাহা কিছু উপকার হয়। ইংলণ্ডে এই শেষোক্ত শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইতেছে।

মনুষ্য ইতরজন্তু উদ্ভিদাদির মত, রাজ্য, সমাজ, জাতি প্রভৃতির একটা নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু আছে। প্রত্যেক জীব যেমন জরাজীর্ণ হইয়া বা কোন সাংঘাতিক পীড়ার দরুণ কালগ্রাসে পতিত হয়, সমাজ রাজ্যাদিও সেই নিয়মের অধীন। জীবজন্তুর ন্যায় জাতি বা সমাজ যদিও একেবারে অন্তর্হিত না হয় কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তি ধারণ করতঃ তাহাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান থাকে যে, তাহাকে আর সে মানুষ বলিয়া চেনা যায় না,—যেমন আমাদের দশা ঘটিয়াছে। দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়া যিনি প্রাকৃতিক বিধানাদির বিপরীত দিকে চলিতে যাইবেন, তাঁহাকে পদে পদে বিপদে পড়িতেই হইবে। সংসারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যিনি ছুটিতে অক্ষম নিশ্চয় জানিতে হইবে, তাঁহার আর উপযোগিতা নাই। উন্মুক্ত স্বাধীন বায়ু মধ্যে লালিতপালিত ইংরাজের আজ যতদূর উন্নত হওয়া উচিত ছিল, ততদূর যেন হইতে পারেন নাই; অর্থাৎ বর্ত্তমানে উঁহাদের মধ্যে যে সংখ্যক উদারচেতা বিশ্বপ্রেমিক লোক আশা করা সঙ্গত, তাহা নাই। ইংলণ্ডের যেন এখন থমথমে ভাব, পূর্ণ জোয়ারের পরে ভাটা পড়িবার একটু আগে গঙ্গার যে ভাঁব। তাহাতেই আশঙ্কা হয়, বেশী ভাল লোক ইংলণ্ডে শীঘ্র আর পাওয়া যাইবে না। লণ্ডনের বিশপ গোর সাহেবের মত লোক হয়ত ক্রমেই কমিয়া যাইবে। তিনি সেদিন কোন প্রকাশ্য স্থানে বলিয়াছেন:—"India exists, not in order that she may be part of England's Empire but in order that she may realise herself"—Bishop Gore অর্থাৎ ইংরাজ-সাম্রাজ্যের একটা অংশ হইয়া চিরকাল থাকিবার জন্য ভারতবর্ষের অস্তিত্ব নয়, নিজেকে নিজে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া উন্নত হওয়াই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য।

প্রঃ। এত শীঘ্র ইংলণ্ডের এরূপ অবনতি হইবার কারণ কিছু বলিতে পারেন কি?

উঃ। ইহার একমাত্র অনিবার্য্য কারণ, ভারতবর্ষের সহিত সংস্রব। মুসলমানেরা কিরূপ তেজের সহিত ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর আজ তাহাদের কি দুর্দশা! স্বেচ্ছাচার উৎপীড়নের অশুভ ফল যে শুধু উৎপীড়ককেই ভোগ করিতে হয়, এমন নহে, উৎপীড়ক উৎপীড়িত উভয়কেই উহা আক্রমণ করিয়া থাকে। উহাতে উভয়পক্ষেরই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। তার পর, একটা সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম, যাহা সবাই জানে, যে শীতল ও উষ্ণ পদার্থ কাছাকাছি থাকিলে ক্রমে পরস্পরের ভাব বিনিময় দ্বারা উভয়ে সমপ্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুদীর্ঘকালের দাসত্বে আমরা হীন, সেইরূপ কালের স্বাধীনতায় উহারা মহৎ, এই দুই বিপরীতভাবাপন্ন দুই জাতির ঘাত প্রতিঘাত সঙ্ঘাতে দোষেগুণে দুই জনকেই সমান অবস্থায় পঁহুছিতে হইবে। গোলাম ও প্রভু, পরস্পরের হাওয়াতে উভয়কেই নীচ হইতে হয়, তবে হিসাব খতাইলে গোলামের লাভ

দাঁড়ায় বলিতে হইবে। ইংরাজ আমাদের দেশে রাজত্ব করার ফলে ধনরত্ন সঞ্চয়ে, বিলাসব্যসনে কৃতার্থ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, পরন্তু দুর্ব্বল অসহায় পতিত ভারতবাসীর উপর অবাধপ্রভুত্বের বাহাদুরী চালাইতে চালাইতে ক্রমে মনুষ্যত্ব হারাইয়া নৈতিক হিসাবে নিম্নগামী হইতেছেন। যাহার চক্ষু আছে সে ইহা বেশ দেখিতেছে। বর্ত্তমান ইংরাজজাতির আদর্শ পুরুষ লর্ড কর্জ্জনকে সম্মুখে রাখিলেই সব সন্দেহ মিটিয়া যায়। বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন দুর্জ্জনকে যে মণিভূষিত বিষধরের ন্যায় পরিহার করা উচিত, তাহার বিশিষ্ট উদাহরণ উক্ত মহাপ্রভু। আর অধিক কি বলিব!!!

হাঁ, আর একটা কথা—উঁহারা বড় চালাক, এক কল খাটাইয়াছেন যে, মুসলমানদের মত এ দেশে বাস করেন না, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল দাঁড়াইতেছে। এক দল যাইতেছেন, এক দল আসিতেছেন, ইহা দ্বারা ক্রমে এত অধিক সংখ্যক নীচাশয়তা-গ্রস্ত ভারত-ফেরত জাব ইংলণ্ডে জমিতেছেন যে, তাঁহাদের সংক্রমণ দোষে ঐ ক্ষুদ্র দেশ অচিরে উৎসন্নের দ্বারে পঁহুছিবে। একা লর্ড কর্জ্জন সহস্র সহস্র ইংরাজকে অপ্রেমের পথে, অসত্যের পথে, অবনতির পথে সবলে টানিয়া লইতে সক্ষম, তারপর কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্জ্জন যে আমরা তৈয়ার করিয়া পাঠাইয়াছি ও প্রতি বৎসর পাঠাইতেছি, তাহার গণনা করে কে।

প্রঃ। যাহা হউক, আমরা এভাবে কত কাল পড়িয়া থাকিব?

উঃ। শুধু যে আমরাই এইরূপে পতিত হইয়াছি, এমন নয়। অনেককেই উঠিতে পড়িতে হইয়াছে। তবে কি জান, যে যত উচ্চস্থান হইতে পড়িয়াছে, তাহার তত উঠিতে বিলম্ব লাগিবেই। এক তালার ছাদ হইতে পড়িলে একটা পা হয়ত সামান্য জখম হয়, সে ক্ষেত্রে শীঘ্র সারিয়া উঠিতে পারা যায়। দোতোলা হইতে যে পড়ে, তাহার পা ভাঙ্গিবারু কথা, তেতোলা হইতে পতনে অনেক জায়গায় বিষম চোট্ খাইতে হয়; সুতরাং উঁহাদের আরোগ্য লাভে বহু বিলম্ব হইয়া থাকে। আমরা হিমালয়ের মত উচ্চস্থানে উঠিয়া সেখান হইতে ডিগ্‌বাজী খাইয়া পড়িয়াছি, তাই আমাদিগকে আজও শয্যাগত অবস্থায় দিন কাটাইতে হইতেছে। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, কোন প্রকারে জীবনটা রক্ষা পাইয়াছে। আর কতকাল পড়িয়া থাকিব? যখন প্রাণটা আছে, তখন প্রকৃতি-দেবী কোন রকমে একদিন খাড়া করিয়া তুলিবেনই। পরন্তু আর শুইয়া থাকা উচিত নয়, এখন কর্ত্তব্য, পায়ে ভর দিয়া একটু একটু চলিতে আরম্ভ করা। চাঙ্গা হইয়া ঘর সামলাইবার লওয়া বড়ই দরকার হইয়াছে। ঘর সাম্‌লাও! ঘর সাম্‌লাও! ঘর সাম্‌লাও! অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হও, বিঘ্ন বিপদ-মৃত্যু তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিখ, স্বার্থ ও রিপু সমূহ মা জগদম্বার চরণে বলি দাও, তাহাদের ছিন্নশির মাতৃচরণে লুটাইলে তবে সিদ্ধ লাভ হইবে। মোট কথা, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রাণটুকু দিয়া তদ্বিনিময়ে মহাপ্রাণ লাভ না করিলে মনুষ্য পদবাচ্য হওয়া যায় না।

প্রঃ। রাজপুরুষগণ যে আমাদিগকে এখন বিদ্রোহের অপবাদ দিতেছেন, সে সম্বন্ধে আপনার কি মত?

উঃ। ইহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অকারণ ভারতবাসী অশান্তি আনয়ন করিতেই পারে না, এমন উদরে তাহাদের জন্মই নয়। দুটা মিষ্ট কথা, দুটা পিঠ্‌চাপ্‌ড়ানি পাইলেই যাহারা কৃতজ্ঞতায় গলিয়া যায়, এমন কি, নিজেদের সমূহ ক্ষতি করিতেও প্রস্তুত হয়, এরূপ ভালমানুষ বা নির্ব্বোধ জাতি কখন সহজে বিরক্ত হইবে না। প্রজা কর্ত্তৃক রাজকার্য্যের সমালোচনার স্বাধীনতা যদি এখন এই ভাবে হরণ করাই প্রয়োজনীয় বোধ হইল, তাহা হইলে আগেই বিবেচনা করিয়া এবম্প্রকার শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল না। যখন তাহা দেওয়া হইয়াছে, তখন ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক, বিভীষিকা না দেখিয়া, তথ্য নির্ণয়ে যত্নবান হওয়াই বুদ্ধিমান সুবিবেচক রাজপুরুষদের কাজ। রাজ্যশাসন, বিশেষ ভারতবর্ষের মত বিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসন বড় সোজা কথা নয়। পাশববলে এই গোলযোগ থামাইয়া শান্তির পুনঃস্থাপনের আশা বাতুলতা মাত্র। কলম বন্ধ হইল, মুখ বন্ধ হইল, কিন্তু মন বন্ধ করে কে? এমন সাধ্য এই বিশ্বে কাহার আছে? প্রাগুক্ত আমেরিকান তত্ত্বদর্শী এক স্থানে বলিয়াছিলেন, :—

"Those who live by hate will die by hate: that is 'those who live by the sword will die by the sword' Every evil thought is a sword drawn on the person to whom it is directed If a sword is drawn in return, so much the worse for both."

অর্থাৎ বিদ্বেষ যাহাদের জীবনের বল বিদ্বেষই তাহাদের মৃত্যুর কারণ হইবে।

প্রবল পরাক্রমশালী রাজপুরুষগণ যদি লোভপরবশ হইয়া রক্তপিপাসু বিদ্বেষ-বুদ্ধি সহকারে অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করেন, নিঃসম্বল অসহায় মেষবৎ প্রকৃতিবর্গ হাতে হাতে তাহার প্রতিশোধ লইতে পারিবে না সত্য, পরন্তু তাহাদের হৃদয়ের গভীর বেদনা ভগবানের চরণ-প্রান্তে উপনীত হইয়া তাঁহার সিংহাসন নিশ্চয় টলাইবে. নচেৎ জানিতে হইবে, ঈশ্বরের রাজ্য লুপ্ত। হরি-কোপানল বড় শক্ত জিনিস, সাতসমুদ্রের জলেও সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার নহে, সমস্ত অন্যায় অপ্রেম ভস্মীভূত করিয়া তবে তাহা নিশ্চিন্ত হইবে। স্থূল দৃষ্টি ইংসর্ব্বস্ববাদী মহাপ্রভুরা অজ্ঞানান্ধতা বশতঃ এ কথা হুট্ করিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু ইংরাজীতে বলে, "Ignorance of law is no excuse,"—বিশ্বেশ্বরের আইন তাঁহাদিগকে ছাড়িবে না, শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, অপরাধের দণ্ড কড়ায় কড়ায় ভোগ করিতেই হইবে।

প্রঃ। কোন দেশপূজ্য স্বনামধন্য মনীষী ব্যক্তি সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন, পৃথিবীতে পূর্ণ মনুষ্যত্ব গঠন করিবার উদ্দেশে মহাপুরুষগণ নিভৃতে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। গোলমাল করিয়া তাঁহাদের তপোভঙ্গ করা ভাল নয়। এ কিরূপ সংবাদ?

উঃ। হাঁ, এ কথা সহস্রবার মানি এবং হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি। তপোবল ভিন্ন সংসারে কিছুই হয় নাই। ব্রহ্মাকেও সৃষ্টি-কার্য্যের পূর্ব্বে তপস্যা করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের ব্যাকুল আহ্বানে ভগবানকে নামিতেই হইবে, কারণ দুর্ব্বলের একমাত্র বল তিনি, এখন তিনি না নামিলে সংসার রাখে কে? পাপ-কংসাসুর যে পৃথিবীকে ছারখার করিল; পৃথিবীময় অপ্রেম, অসত্য, অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন দুর্দ্দিনে জগদীশ্বর স্বয়ং না দেহধারণ করিলে আমাদিগকে আর কে রক্ষা করিবে? এরূপ আশা করা অসঙ্গত নয় যে, সমগ্র জগতে সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিমল প্রেমের রাজ্য সংস্থাপিত হইবে। খ্রীষ্টানগণ বলেন, সে জন্য যিশু পুনরায় আসিতেছেন, মুসলমানদের বিশ্বাস মির্জ্জামেহেদী আসিয়া সে কার্য্য সম্পাদন করিবেন। যাহা হউক, মহাপ্রভাবশালী ঐশীশক্তি-সম্পন্ন একজন যে শীঘ্র আসিতেছেন, তাঁহার প্রতীক্ষায় অনেকেই সতৃষ্ণনয়নে পথপানে চাহিয়া আছেন। তাঁহারা বলেন, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায় ভেদ আর থাকিবে না, ফরাসী, ইংরাজ, জর্ম্মাণ, ওলন্দাজ, জাপানী চীনা, পার্সি, তুর্কী, ইউরোপীয়, এশিয়াটিক, আফ্রিকান, আমেরিকানাদি জাতিসমূহ এক মানবজাতিতে পরিণত হইবে। প্রত্যেক দেশে স্বতন্ত্র ভাষা থাকিলেও সর্ব্বসাধারণের জন্য একটা ভাষা হইবে, যাহা সকলকেই শিখিতে হইবে। ভারতীয় দর্শনবিজ্ঞান পৃথিবীর পূজ্য হইয়া হইবে, সুতরাং ভারতবাসী আর্য্যগণ সকলের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিবে। ইহার কতক কতক আভাস ত এখনই দেখা যাইতেছে। বেদান্ত ও গীতার আলোচনা সভাজগতের কোথায় না চলিতেছে? আরও অনেক গুরুতর গুহ্য কথা আছে, যাহা এখন প্রকাশযোগ্য নয়, ক্রমে সকলেই দেখিবে।

অনেক দিন হইতে ঐ শুভ সংবাদ শুনিতেছি, কিন্তু কাহাকেও বলিতে সাহস হয় নাই। এই বিরাট ব্যাপারের সূচনা প্রিয়বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা স্বর্গ হইতে "বন্দেমাতরম" মহামন্ত্রের আনয়ন, কারণ বাঙ্গালীকে এই যজ্ঞের হোতা হইতে হইবে। এই মহাবাক্য বোমা নির্ম্মাণের জন্য আসে নাই, সংসারে বিপ্লব ঘটাইবার জন্য অবতীর্ণ হয় নাই; পক্ষান্তরে সত্য, প্রেম ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইহা আসিয়াছে, ইহা স্বয়ং ভগবান বঙ্কিমের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন। এই বীজমন্ত্র তোপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত হইও না, কামানের উদ্গীরিত অনল তজ্জন্য কাহাকেও ভস্মীভূত করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার স্বর্গলাভ হইবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

ছাত্র জীবনের আদর্শ।*

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা ক্রমে ক্রমে কোন না কোন বিষয়ে জীবনের একটা ছাঁচ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি। তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, সেই অনুসারেই আমাদিগের জীবন পরিচালিত হয়। আমরা যে কার্য্যই করি না কেন, আমাদের সম্মুখে তাহার একটা আদর্শ সর্ব্বদায়ই প্রায় উপস্থিত থাকে। আদর্শতেই আমাদের জীবন গঠিত হয়। বাল্যকালে হাতের লেখাটী প্রস্তুত করিতে হইলে, আমরা একখানি কাপিবুক সম্মুখে রাখিয়া তদনুসারে হস্তাক্ষর প্রস্তুত করিতে যত্নবান হই। আমাদের চলাফেরা ও কথা বলার মধ্যেও আমরা অজ্ঞাতসারে অনেক সময় অপরের অনুকরণ করিয়া থাকি। আমাদের গৃহ-পরিবার, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, আমাদের প্রতিবেশী বিদ্যালয়, কার্য্যক্ষেত্র সকলেই আমাদের জীবনকে গঠন করিতেছে। কোন এক গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন, যখন ক্ষুদ্র শিশু মাতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া স্তন পান করে, তখন জননীর প্রত্যেক অঙ্গচালনার কার্য্যটীও শিশুর কোমল প্রাণের উপর একটা ছাপ মারিয়া দেয়। এইজন্য দেখা যাইতেছে, আমাদের সম্মুখে যেমন আদর্শ থাকে, আমাদের জীবনটাও সেই আকার ধারণ করে। উচ্চ ও মহৎ আদর্শ জীবনের সম্মুখে ধর, জীবন মহৎ হইবে, ছোট আদর্শের সম্মুখে থাক, জীবন ছোট হইয়া যাইবে।

ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যেমন, জাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের সম্মুখে পূর্ব্বতন গ্রীক ও রোমক-জাতির উচ্চতর আদর্শ যদি না থাকিত, তাহা হইলে ইংলণ্ড শিল্প, সাহিত্য ও আইন-কানুনে বড় শীঘ্র উন্নতির উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইতেন না। ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় এক জাতি অপর জাতির ভালমন্দ গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যখন আদর্শের উপরেই আমাদের জীবনের মঙ্গলামঙ্গল অধিকতর পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, তখন যাহা সৎ, যাহা মহৎ, যাহা মঙ্গলকর, তাহাই আমাদের আদরণীয় হওয়া উচিত—তাহাই অনুকরণযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। আমরা শুনিয়াছি,

"যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি"।

আদর্শ সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। একবার কোন স্থানে কয়েকটী বালক খেলা করিতেছিল, তাহার মধ্যে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট সাজিয়াছিল। আর একজন পেয়াদা সাজিয়া হাকিমের হুকুম বাহাল করিতে প্রস্তুত হয়। যে ছেলেটী হাকিম হইয়া ব'সে, সেটী গবর্ণমেণ্টের একটী উচ্চতর কর্ম্মচারীর পুত্র; পেয়াদা সাজে সজ্জিত ছেলেটী একটী সামান্য কর্ম্মচারীর পুত্র। ঘটনাক্রমে পেয়াদা-বেশধারীর ছেলেটীর

---

* [illegible] শনিবার সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ছাত্রসমাজের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু কর্ত্তৃক পঠিত।

হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হন, হইয়া দেখিলেন, ছেলে পেয়াদা সাজিয়াছে, একটু দাঁড়াইয়া অতি দুঃখের সহিত ছেলেকে বলিলেন, যদি সাজ্‌লি ত পেয়াদা সাজ্‌লি। অর্থাৎ এখন হইতেই তোর মনের আদর্শটা এত ছোট। আদর্শের এমনই প্রভাব যে, হনুমানের কোন ভক্ত উপাসক সর্ব্বদা বৃক্ষের উপরে থাকিয়া তাঁহার উপাস্য দেবতার ন্যায় সময় কাটাইতে ভালবাসিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হনুমানজীর জীবনের প্রভাব ঐ তদীয় ভক্তের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

এখন আমার বক্তব্য বিষয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছি। ছাত্র-জীবনের কিরূপ আদর্শ হওয়া উচিত, তদ্বিষয় আলোচনা করিতে গেলে কোন্ সময়কে ছাত্রজীবন বলিব? পূর্ব্বে গ্রীস ও রোমে চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ছাত্রেরা শিক্ষকের অধীনে থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের বিষয় শিক্ষা লাভ করিত। আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে ঋষিদিগের অধীনে প্রায় ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত ছাত্রেরা অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। ইয়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ অনুসারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইয়াছে। এখানেও সাধারণতঃ ছাত্রেরা ত্রয়োবিংশ কি পঞ্চবিংশ বৎসর বয়সে শিক্ষার উচ্চতম প্রশংসাপত্র লইয়া বহির্গত হইয়া থাকেন।

জ্ঞানানুরাগী চিরদিনই আপনাকে ছাত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহার যত বয়স বৃদ্ধি হয়, তিনি ততই আপনাকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করেন—এ জ্ঞানময় জগতের নিকট তিনি চিরদিনই শিক্ষার্থী থাকিয়া, ইহলোক হইতে অবসৃত হন। এইরূপ চিরজীবন ছাত্রাবস্থার বিষয় আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বাল্যকাল ও তরুণ যৌবনকেই আমি আমার বক্তব্য বিষয়ের লক্ষ্য করিয়া তদ্বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আমাদের দেশের পূজ্যপাদ ঋষিরা জ্ঞানসাধনকেই ছাত্রজীবনের উচ্চতম তপস্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মস্তিষ্ককে উত্তমাঙ্গ বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সকল অঙ্গ অপেক্ষা এ শ্রেষ্ঠতম অঙ্গের উৎকর্ষ-সাধন নর নারীর প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়াই তাঁহারা মনে করিতেন। যাহার উৎকর্ষসাধনে মানব আকাশস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দূরত্ব নিরূপণ করিতে ও তাহাদিগের বিচিত্র গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে সক্ষম হয়;—যাহার প্রভাবে দূরস্থিত পথকে যেন মানবের গোষ্পদের ন্যায় পার হইবার ব্যবস্থা করিয়া দেয়, —যাহার প্রভাবে আমাদের সুখদুঃখে, সম্পদ বিপদের সমাচার চক্ষের পলকে আমাদের নিকট উপস্থিত করে,—যাহার প্রভাবে নানাবিধ বিষয় সকল উদ্ভাসিত হইয়া নর নারীকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করিতেছে, সেই মহোচ্চ বিষয়ের যথোচিত উন্নতিসাধনে সকলেরই যে তৎপর হওয়া উচিত, সেবিষয়ে কি আর অধিক বলিবার প্রয়োজন আছে?

যাঁহারা মানসিক উন্নতি সাধনে আপনাকে বিশেষ রূপে নিয়োগ করেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ের নির্ম্মল আনন্দের নিকট, সংসারের অনেক আমোদ প্রমোদ অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। তাঁহারা নিজ হৃদয়ের মধ্যে কত মনোহর সৌন্দর্য্য দর্শন করেন, কত অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া অপার আনন্দে মগ্ন হইয়া পড়েন। তাঁহার সেই অন্তরের আনন্দের

নিকট রাজার রাজত্ব লাভের আনন্দও তিনি সামান্য বলিয়া বিবেচনা করেন। জগতের বিচিত্র রহস্য দর্শনে—নর নারীর প্রকৃতি ও কার্য্যকলাপ দর্শন ও অধ্যয়নে তাঁহার হৃদয় মন বিস্ফারিত হইয়া উঠে—তাঁহার কল্পনাশক্তি প্রসারিত হয়। দরিদ্র হইয়াও তিনি যেন রাজপ্রাসাদে বাস করেন; আর বহু দাসদাসী পরিবেষ্টিত, রাজপ্রাসাদ-বাসী, মনিমুক্তা-শোভিত, রাজমুকুটধারী সম্রাটও এই ধনে বঞ্চিত হইয়া দরিদ্র শিক্ষিতের উচ্চতর আনন্দ লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, দুদ্ধর্ষ রোমের সম্রাট নিরোর বাটীতে ইপিকটেটস্ নামে এক ক্রীতদাস ছিল; নিরো কৌতূহল চরিতার্থের জন্য ইপিকটেটসের একখানি পা ভাঙ্গিয়া দেন; ইপিকটেটস্ ক্রীতদাস হইয়াও সময়ে সময়ে পাঠে রত থাকিতেন। নিরোর শিক্ষক দার্শনিক সেনেকা এই দাসের পাঠানুরাগ দেখিয়া, উহাকে মুক্তি দিবার জন্য নিরোকে অনুরোধ করেন, নিরো শিক্ষকের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। ইপিকটেটস্ দাসত্বে মুক্তি লাভ করিয়া গভীর রূপে জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইনিই তাৎকালীন দার্শনিকদিগের মধ্যে অতি উচ্চতম স্থান অধিকার করেন। সামান্য কুটীরে বাস করিয়া দরিদ্রের ন্যায় দিন যাপন করিতেন। শিষ্যেরা তদীয় গুরুর সেই কুটীরে গমন করিয়া দর্শন শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। একবার কোন সম্রাট এই সুবিখ্যাত পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হন; গিয়া দেখেন, দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ ইপিকটেটস্ রৌদ্রে বসিয়া শীত নিবারণ করিতেছেন। সম্রাটের আগমনে তাঁহার গাত্রে সূর্য্যের কিরণ পতনের কিছু ব্যাঘাত জন্মিল; ইপিকটেটস্ বলিলেন, "আপনি রৌদ্র ছাড়িয়া কিছু দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হউন—রৌদ্র লাভের ব্যাঘাত করিবেন না।" সম্রাট বলিলেন, আমি আপনার নিকট ষ্টোইক দর্শনের উপদেশ লাভের জন্য আগমন করিয়াছি। ইপিকটেটস্ বলিলেন, আপনি এ কঠোর বিষয় শিক্ষা করিয়া কি করিবেন? সম্রাট তদুত্তরে বলিলেন, "আমি আপনার দর্শন শিক্ষা করিয়া, তদনুসারে জীবন পরিচালিত করিলে, আমি আপনার ন্যায় দরিদ্র হইয়াই থাকিব।" ইপিকটেটস্ বলিলেন, "কি! আপনি আমাকে দরিদ্র মনে করেন?" ইহা বলিয়া তিনি আপন বক্ষঃস্থলের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলে, My mind to me a kingdom is! আমার হৃদয়ের মধ্যেই রাজত্ব রহিয়াছে। লর্ড মেকলের সম্পত্তি ও সম্ভ্রম বড় কম ছিলনা, তিনি একবার কাহাকেও অধ্যয়নের উপকারিতা সম্বন্ধে এক পত্র লেখেন, তৎপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন "I would rather be a poor man in a garret with plenty of books than a king who did not love reading" ভাবার্থ এই, অধ্যয়ন-বিমুখ রাজা অপেক্ষা পুস্তকরাজির মধ্যে একটা গৃহে দরিদ্র অবস্থায় দিন অতিবাহিত করাও শ্রেয় বলিয়া মনে করি।

জ্ঞানের সকল দিকেই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি আজ এস্থলে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিজ্ঞান-মহারথীদিগের কয়েকটী বিষয় আলোচনা করিব। ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে দুইটী বিশেষ দুর্ঘটনা ঘটে; একটী প্লেগ, অপরটী অগ্নিদ্বারা বহু সংখ্যক গৃহ ভস্মীভূত হওয়া। হকসিলি বলেন, ইংলণ্ডবাসীরা প্লেগকে পর-

ঈশ্বরের অভিসম্পাৎ বলিয়া মনে করিয়াছিল, আর অগ্নি সংযোগে গৃহ-ভস্মসাৎকে তাহারা মানবের অজ্ঞানতা অথবা শত্রুপক্ষের বৈর-আচরণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছিল। তাঁহার এক বক্তৃতায়,এই বিষয় উল্লেখ করিয়া তৎকালে ইংলণ্ডবাসীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,"Our forefathers had their own ways of accounting for each of these calamities. They admitted to the plague in humility and in penitence, for they believed it to be the judgment of God. But towards the fire they were furiously indignant, inter-preting it as the effect of the malice of man" তৎপর তিনি বলিলেন, যদি তাহারা এখানকার ন্যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মর্ম্ম ভালরূপ অবগত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতেন—"that all their hypotheses were alike wrong ....but that they were themselves the authors of both plague and fire"প্লেগ ও অগ্নি,এ দুই তাঁহাদিগেরই দোষে ঘটিয়াছে। হক্সিলি বলেন,সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে দ্বাদশজন যুবাপুরুষ সমবেত হইয়া রোগের কারণ নির্ণয়ে এবং বিবিধ বিষয়িণী বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তৎপর হইতেই ইংলণ্ডের গতি ফিরিতে আরম্ভ হয়।

গ্রীস ও রোমে ছাত্রদিগকে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইত, তন্মধ্যে সাহিত্য, সংগীত ও শারীরিক বল লাভেরই ব্যবস্থা লক্ষিত হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষার কোন ব্যবস্থা লক্ষিত হইত না। আমাদিগের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে ছাত্রেরা ব্যাকরণ পাঠে ও ন্যায় শাস্ত্রের কূটিল তর্কে যৌবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দিতেন। পূর্ব্বতন আর্য্যেরা বিজ্ঞানের কোন কোন বিষয়ে আলোচনা করিলেও তাহা আমাদিগের নিকট ভস্মাচ্ছাদিতের ন্যায় রহিয়াছে বলিতে হইবে। উহার অধিকতর আলোচনা ও প্রসারণের জন্য আমরা পাশ্চাত্য জগতের নিকট ঋণী, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা কখনই ইহার উন্নতি সাধনে আপনাদিগের হস্ত প্রসারণ করেন নাই। ভারতীয় ধর্ম্মাচার্য্যেরা আত্মার কল্যাণ সাধন ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েরই প্রতি আমাদিগকে বীতরাগ প্রকাশ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, কেবল আত্মজ্ঞান লাভ করাই তাঁহাদিগের শিক্ষার মূল্য উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টের শিষ্যেরা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইউরোপে যে সময়ে বিজ্ঞানবিদেরা পৃথিবীর গতি ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সঠিক তত্ত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন বাইবেল-বর্ণিত পৃথিবীর জন্ম প্রভৃতির উপর দারুণ আঘাত পড়াতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরা বিজ্ঞানের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। ডুবর্গ মেরীর নৃশংস ব্যবহারে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী রিডাল, লাটিমার প্রভৃতি মহামনা ব্যক্তিগণ যেমন জীবন হারাইয়াছিলেন, তেমনি চর্চ্চের উৎপীড়নে গ্যালিলিউ প্রভৃতি বিজ্ঞানবিৎদিগকে মৃত্যুর হস্তে জীবন সমর্পণ করিতে হইয়াছিল।

বিজ্ঞান অথবা অন্য কোন শিক্ষা-বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা আমার এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। এখন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা কিরূপে প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে, অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও আপনাদিগের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,সেইরূপ কয়েকটী দৃষ্টান্ত এখানে

উল্লেখ করিতেছি। প্রতিভা সর্ব্বোপরি হইলেও ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অতি আশ্চর্য্য।

একদিন ডিউক-অব-আর্গাইল আপন উদ্যানে পাদচারণা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন, তৃণের উপর স্যার আইজ্যাক নিউটন-প্রণীত একখানি পুস্তক পড়িয়া রহিয়াছে। ডিউক পুস্তকখানি নিজের মনে করিয়া তাঁহার ভৃত্যের পুত্র ষ্টোনকে উহা গৃহের মধ্যে রাখিতে বলিলেন, ভৃত্যপুত্র ষ্টোন বলিল "পুস্তকখানি আমার।" ডিউক বলিলেন, "তোমার, তুমি কি ইহা বুঝিতে পার? ষ্টোন মৃদুস্বরে বলিল "আজ্ঞা হাঁ।" ডিউক বলিলেন, এ পুস্তক বুঝিতে হইলে অঙ্কশাস্ত্রে ভালরূপ অধিকার থাকা প্রয়োজন, তুমি গণিতবিদ্যা কোথায় শিক্ষা করিলে? ষ্টোন বলিল, "রাজমিস্ত্রীরা আপনার বাড়ীতে কার্য্য করিতেছিল, একদিন দেখি, তাহারা কম্পাস লইয়া বাড়ীতে কোন অংশ মাপ করিতেছে, উহা হইতে আমি বুঝিলাম, গণিত বিদ্যা বলিয়া এক বিদ্যা আছে। আমি অঙ্কের পুস্তক ক্রয় করিলাম; তৎপর জ্যামিতি ও বিজ্ঞানের পুস্তকাদি পাঠ করি, ফরাসী ও লাটিন ভাষায় অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল পুস্তক আছে, তাহা দেখিবার জন্য, ফরাসী ও লাটিন ভাষার অভিধান ক্রয় করি। আমি এ সকলই নিজে শিক্ষা করিয়াছি।" আবার ষ্টোন বলিল, "মানুষ যখন বর্ণমালার ২৪ টা অক্ষর শিক্ষা করে, তখন সে সকল বিষয়েই ক্রমে নিজ যত্নে শিক্ষা করিতে পারে।" এ যত্ন ও জ্ঞানপিপাসার কথা শুনিয়া কোন্ ব্যক্তি না অবাক হইয়া থাকে? ডিউকের সাহায্যে তদবধি তাঁহার জ্ঞানচর্চ্চার সুবিধা হইল। তিনি অবশেষে অঙ্ক শাস্ত্র বিষয়ে পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এক মুচির ছেলে নিজের অধ্যবসায়ের গুণে অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 'কোন মহিলা, একবার আমার নিকট একখানি বীজগণিত রাখিয়া যান। পুস্তকখানির মধ্যে কি আছে, তাহা জানিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল জন্মিল। ক্রমে সহজ অঙ্কে কিছু অধিকার লাভ করিয়া উক্ত পুস্তকের বিষয় ভালরূপেই আয়ত্ত করি। আমার অবস্থা উন্নতি লাভের সম্পূর্ণ প্রতিকূলই ছিল। কালী, কলম অথবা কাগজ আমার কিছুই ছিল না, এজন্য চামড়া পরিষ্কার করিয়া জুতাশেলাই করিবার লোহার কাটির দ্বারা তদুপরি অঙ্ক কসিতাম। তিনি বলিতেছেন—"I beat out pieces of leather as smooth as possible and wrought my problems on them with a blunted awl."

অবশেষে কোন বন্ধুর অনুরোধে তিনি কয়েকটী কবিতা রচনা করেন, ঐগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। ইহাতে তাঁহার কিছু অর্থাগম হইয়াছিল। উহার দ্বারা অঙ্কশাস্ত্রের পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া মনের সাধে গণিতের চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল। তিনি গণিত সম্বন্ধে পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

একটী অন্ধ বালকের পরিচয় গ্রহণ করুন। নিকোলাস সণ্ডার্সন জন্মের এক বৎসর পরেই অন্ধ হন। কিছু বয়স হইলে তিনি বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তথায় গ্রীক ও লাটিন ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু গণিত বিদ্যার দিকেই তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিল। কেম্ব্রিজে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা জন্মিল, কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার সে

ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। তিনি কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত অঙ্ক ও পদার্থ বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। যিনি অর্থাভাবে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই, অবশেষে তিনিই কেমব্রিজের গণিত ও পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সণ্ডার্সন Doctor of Law উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রতীচ্য জগতের এইরূপ বহুল দৃষ্টান্ত আমাদিগকে সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে প্রোৎসাহিত করে।

ছাত্র জীবনকে প্রোৎসাহিত করিতে প্রতীচ্য জগতের ন্যায় ঐরূপ বহুল দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে না থাকিলেও, একেবারে নাই, এমন নহে। আমাদের চক্ষের সম্মুখেই দুইজন মনিষী ব্যক্তির অসাধারণ অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঈশ্বর চন্দ্র বীরসিংহ-নিবাসী দরিদ্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। ঠাকুরদাস ৫।১০ টাকা বেতনের কাজ করিয়া পুত্রকে লেখা পড়া শিক্ষা দেন। ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। বাসায় সকলের রন্ধনাদি করিয়া দরিদ্র বালকের ন্যায়ই বিদ্যালয়ে গমন করিতেন। এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন। বাল্যকাল হইতেই, ঈশ্বরচন্দ্র দুঃখ দারিদ্র্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, আপনার গন্তব্যস্থানে উপনীত হইতে, অর্থাৎ ছাত্র-জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। তিনি যেন ইচ্ছাশক্তির লৌহ দণ্ড হস্তে করিয়া বিঘ্ন বাধাকে আসযুক্ত করিয়া বলিলেন, "সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও, আমার কর্ত্তব্য সাধন করিতে দাও।" ছাত্রাবস্থায় ঐরূপ সিংহ বলে প্রণোদিত না হইলে তিনি কি পরিণামে বিদ্যাসাগর হইতে পারিতেন?

আর এক ব্যক্তি। ইনি বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত। প্রায় ১৮ বৎসর বয়সের সময় ইঁহার রীতিমত বিদ্যারম্ভ হয়। কলিকাতায় কোন ব্যক্তির বাসায় থাকিয়া ইনি গৌর মোহন আড্ডির স্কুলে গমন করিতেন। ইনি বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সকলের মা বলে লেখা পড়া শেখ, আমার মা তাহার বিপরীত কথাই বলিতেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় ইনিও বঙ্গসাহিত্যের কিরূপ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। ১৮ বৎসর বয়সে এক প্রকার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়া ৩৬ বৎসর বয়সের সময় দারুণ শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। এই দারুণ রোগের মধ্যেও তিনি ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগ বাহির করিয়াছিলেন। উপাসক সম্প্রদায় দুই খণ্ড রচনা করিয়া অক্ষয় কুমার বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইনিই বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রবেশ করাইয়া উহার পরিপুষ্ট সাধনে যত্নবান ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা এতই প্রবল ছিল যে, বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন বিষয় রচনা করিবার সময় তৎসম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের অল্পতা দর্শন করিয়া Medical Collegeয়ে ভর্ত্তি হইয়া উহা শিক্ষা করেন। অক্ষয় কুমার রাত্রিতে ছাদের উপর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা নক্ষত্ররাজি দর্শন করিতেন, তাঁহার পত্নী সেজন্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, পত্নীকে শয্যায় ফেলিয়া যুবা পুরুষ রাত্রিতে আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে, এমন ত দেখি

কোথায় শুনি নাই। তিনি রূপকচ্ছলে "স্বপ্নদর্শন-বিদ্যা বিষয়ক" যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি জ্ঞান চর্চ্চাকে মানব জীবনের কি মহৎ ব্রত বলিয়াই মনে করিয়াছেন, যাঁহারা উহা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

আমাদের দেশের শাস্ত্র ও পুরাণাদির মধ্যেও জ্ঞানানুশীলনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সুন্দর উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—জ্ঞানী ব্যক্তির ভূয়সী প্রশংসা পরিলক্ষিত হয়। মহাভারতকার বলিয়াছেন, "মৃত্যু কেশাকর্ষণ করিয়া রহিয়াছে, ইহা জানিয়া ধর্ম্ম আচরণ করিবে, আর নিজেকে অজর ও অমর জানিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে।" আমরা মনুসংহিতায় দেখিতে পাই "যিনি বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ জন্মের কারণ হন, যিনি বেদাদি ব্যাখ্যান দ্বারা স্বধর্ম্মের উপদেশ করেন, সেই ব্রাহ্মণ, বালক হইলেও, বৃদ্ধ জনেরও ধর্ম্মতঃ পিতৃবৎ মাননীয়। অঙ্গিরার পুত্র বালক হইয়াও সাতিশয় বিদ্বান ছিলেন বলিয়া পিতৃব্য ও বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃব্যপুত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন; তিনি তাঁহাদিগকে "পুত্রক" শব্দে অহ্বান করিয়াছিলেন। পুত্রক বলাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতাদিগের নিকট তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন; তাহাতে দেবতারা সমবেত হইয়া বলিয়াছিলেন, "বালক যাহা বলিয়াছে, তাহা অন্যায় নহে। কারণ অজ্ঞ ব্যক্তি বৃদ্ধ হইলেও বালক, এবং যিনি জ্ঞানোপদেষ্টা, তিনি বালক হইলেও পিতৃবৎ পূজনীয়।" মনু আর এক স্থানে বলিতেছেন,—

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ

"মস্তকের কেশ পাকিলেই যে বৃদ্ধ হয়, এমন নহে, কিন্তু যিনি যুবা হইয়াও বিদ্বান, দেবতারা তাহাকেই বৃদ্ধ বলিয়া জানেন।"

মস্তিষ্ক উত্তমাঙ্গ, তাহাতে সংশয় নাই; যদি ক্ষুদ্র জীবের ভালরূপ মস্তিষ্ক থাকিত, তবে সেও প্রকাণ্ড হস্তিকে আপনার বশে আনিতে পারিত, ইহাও বিশ্বাস করি; কিন্তু যে আধারে এই বুদ্ধির যন্ত্রটী স্থাপিত হয়, তাহার উন্নতি-সাধনে বীতরাগ প্রকাশ করিলে মস্তিষ্ক হীনবল হইয়া পড়ে। একদিগের ওজন অতিরিক্ত বাড়াইয়া দাও, অপরদিক অনুরূপ আকার ধারণ করিবে, সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে না। স্পেন্সর যথার্থই বলিয়াছেন—
"Nature is a strict accountant; if you demand of her in one direction more than she is prepared to lay out, she balances the account by making a deduction elsewhere." গ্রীকদিগের শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে ছাত্রদিগের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে শারীরিক বললাভের প্রতিও সমভাবে দৃষ্টি রাখা হইত।

নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করা ছাত্রদিগের একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ভাল ছাত্র আমাকে একবার বলিয়াছিলেন যে, এক ঘণ্টা নিয়মিত ব্যায়ামে কেবল যে শরীরের বললাভের সহায়তা হয়, তাহা নহে; উহার দ্বারা দীর্ঘ সময় অধ্যয়নের সহায়তা করিয়া থাকে। কেবল ব্যায়ামের দ্বারাই যে শরীর রক্ষিত হয়, তাহা মনে করা উচিত নয়। প্রকৃতির নির্ম্মল বায়ুসেবন, পুষ্টিকর দ্রব্যভক্ষণ, যথাসময়ে আহারাদির প্রতি দৃষ্টি রাখা, এ সকল শরীরের বলবিধান ও দীর্ঘজীবন লাভের বিশেষ উপায় বলিয়া আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কত উৎকৃষ্ট ছাত্র, পাঠ্যাবস্থায় শরীরের প্রতি

উপেক্ষা করিয়া, ভবিষ্যতে রুগ্নদেহে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। একজন কৃতবিদ্য যুবক, দুঃখ করিয়া আমার নিকট বলিয়াছিলেন, আমার শরীর যেরূপ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাতে আমার এখন মনে হয়, আমার এম্-এ উপাধি লাভ করা অপেক্ষা, যদি সুস্থ শরীরে এ সংসারে বাস করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি নিজেকে বড় সুখী মনে করিতাম। রুগ্নের নিকট নক্ষত্র বিরাজিত আকাশমণ্ডল, সরোবরের প্রস্ফুটিত শতদল, নবীন ভানুর তরল-কিরণে শোভিত, তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ, যেন সকলেই কালিমায় আচ্ছাদিত বলিয়া প্রতীয়-মান হয়। এ ধন ধান্যপূর্ণ সংসারে তিনি ধন কুবের হইলেও অতি দুঃখী, পণ্ডিত হইলেও তাঁহার শিক্ষা জনসাধারণের হিতার্থে বিশেষরূপে নিয়োজিত হইবার সুবিধা হয় না।

শারীরিক নিয়ম অবগত হইয়া এবং তৎ-পালনে, আমরা শরীরের সুস্থতা ও দীর্ঘ-জীবন লাভ করিতে পারি। মার্কিন দেশের কোন এক ডাক্তারকে কোন ব্যক্তি তাঁহার বয়স জিজ্ঞাসা করেন, ডাক্তার প্রশ্নকারীকেই তাঁহার বয়স অনুমান করিতে বলিলেন। প্রশ্নকারী বলিলেন, আমার অনুমান হয়, আপনার বয়স পঞ্চাশের অধিক হইবে না; ডাক্তার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, পঞ্চাশে আর কুড়ি যোগ করুন; ইহা বলিয়া মার্কিন ডাক্তার বলিলেন, আহারাদির নিয়ম রক্ষা—শারীরিক নিয়ম রক্ষা দ্বারা এ বয়সে যৌবনের তেজ ও স্মারকতা শক্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, সূর্য্যগ্রহণের সময় যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে সে ছেলে, চির-রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। আমাদের পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঠিক গ্রহণের সময়ই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হন। পণ্ডিতপ্রবর তাঁহার পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—পিতা ঠাকুর মহাশয় মিতাচারী ও মিতাহারী ছিলেন বলিয়াই তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অধ্যাপক টিনডেলের মতে নরনারীর পরমায়ু অন্ততঃ ১০০ বৎসর হওয়া উচিত। তিনি বলিয়াছেন, শারীরিক নিয়মে অজ্ঞতা প্রভৃতি হেতুই আমরা অল্পায়ু হইয়া থাকি।

শারীরিক স্বাস্থ্য বিধানের পক্ষে, যেমন নির্ম্মল বায়ু সেবন, নিয়মিত আহার প্রভৃতি বিষয়ে সকল শরীরতত্ত্ববিদদিগেরই প্রায় এক মত দেখা যায়, তেমনি অন্য দুই একটী বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা যায়। কাহারো কাহারো মতে সুরাপান স্বাস্থ্য-বিধানের একটা উপায়। সুরাপান বিষয়ে, অথবা স্বাস্থ্যলাভের কোন একটা বিশেষ বিষয় লইয়া আলোচনা করা আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সুরাপান স্বাস্থ্য-লাভের বিপরীত বলিয়াই প্রতীচ্য জগতের মাদক নিবারণী-সভার অগ্রণীরা লেখনী চালনা করিতেছেন। সুরাপায়ীর মাত্রা যখন কিছু চড়িয়া যায় তখন তিনি মহাপণ্ডিত হইলেও তাঁহার উচ্চশিক্ষা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ থাকিতে দেয় না; এ কথা কেন বলিতেছি, ইহার দৃষ্টান্ত অনেক ঘটিয়াছে। সুরার ঝোঁকে টলিতে টলিতে কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি গৃহে আসিয়া তাঁহার এক ক্ষুদ্র কন্যার চক্ষে গরম দুগ্ধ ঢালিয়া দিয়া তাহার একটী চক্ষু নষ্ট করিবার কারণ হইয়াছিলেন। হিব্রুজাতির মধ্যে একটী প্রবাদ আছে "যেখানে শয়তান

স্বয়ং গমন করিতে না পারেন, সেখানে তিনি সুরা পাঠাইয়া দেন।" শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষ সম্মানের পাত্র Sir John Lubbock কি বলিতেছেন শুনুন "The word drink *is often used as synonymous with* alcohol—the great curse of northern nations—Honest water never made any one a sinner but crime may almost be said to be concentrated alcohol" আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সুরারূপ বিলাতী বিষ প্রবেশ করিয়া বহুলোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আজ শিক্ষিতদলের মধ্যে যদিও ইহার প্রাবল্য অধিক দৃষ্ট হয় না, তথাপি ইহার মোহিনী, সর্ব্বনাশিনী শক্তি হইতে সকলেই যে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন, এমন মনে হয় না। আজ এই প্রসঙ্গে দুইজন মহাপুরুষের নাম উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার ও কেশবচন্দ্র সেনের যত্নেই কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা ইহার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আহারাদির নিয়ম রক্ষা ও অঙ্গচালনা শরীর-রক্ষার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি, সংশয় নাই। এ সকল ব্যতীত চিত্ত সংযম ও মনের প্রফুল্লতার উপরেও শরীরের উন্নতি বিশেষরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। চিত্তের সন্তোষকে মহৌষধি বলিয়া অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন। মনের মধ্যেই আমাদের অনেক পীড়ার বীজ নিহিত থাকে। তুমি ভাব, আমার জ্বর হইয়াছে, ভাবের প্রাবল্যহেতু তোমার গাত্র গরম হইয়া উঠিবে, নাড়ী দ্রুতগতিতে চলিতে থাকিবে। অনেকের ধারণা, মনের ব্যাধিই শরীরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোকেরা ইচ্ছাশক্তির পরিচালনায় দ্বারা রোগের প্রতীকার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। যাহা হউক, চিকিৎসকদিগের মনোবিজ্ঞানে অধিকার থাকা আবশ্যক বলিয়া অনেকে স্বীকার করিতেছেন।

প্রবৃত্তির উপর অধিকারে আমরা মানসিক শক্তি ও প্রফুল্লতা অনেক স্থলে লাভ করিতে সমর্থ হই। আমরা শুনিতেছি, মানুষ যখন ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তাহার শরীরের রক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠে। কোন গ্রন্থকারের পুস্তকে পড়িয়াছি, কোন নারী সন্তানকে স্তনের দুগ্ধ পান করাইবার সময় কোন কারণে ক্রোধে অধীর হইয়া যেন আত্মহারা হইয়া পড়েন, তদবস্থায় তাঁহার ঐ শিশুটী যেন কি রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তদবস্থায় তাঁহার ঐ শিশুটী যেন কি রোগগ্রস্ত হইয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল। উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা বলেন, জননীই সেই শিশুর মৃত্যুর কারণ, ক্রোধানল ঐ নারীর রক্তবিন্দুকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল—শিশুর কোমলকণ্ঠে সেই দূষিত শোণিত প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিল। শত বৎসরের অধিক কোন রমণীকে তাঁহার দীর্ঘজীবনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, বাল্যকাল হইতে আমি কখন ক্রোধের অধীন হইয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না—সন্তোষ ও প্রফুল্লতাকে আমার চিত্তের প্রধান অবলম্বন করিয়াই আজীবন চলিয়াছি।

আর একদিক। এইটীর প্রতি সকল মানবের বিশেষতঃ তরুণবয়স্ক ছাত্রদিগের বিশেষ দৃষ্টিরাখা উচিত। শরীরতত্ত্ববিদেরা, চিকিৎসকেরা একবাক্যে সকল সময়েই স্বীকার করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়-সংযম ও ইন্দ্রিয়ের যথাযথ ব্যবহারেই মানব অনেক রোগের হস্ত হইতে দূরে থাকিতে সমর্থ হয়; দীর্ঘ

জীবন লাভ করিয়া বার্দ্ধক্যেও বহুল পরিমাণে শরীর মনের তেজ অক্ষুন্ন রাখিয়া যথার্থ মানব নামের গৌরব রক্ষা করিতে পারে। শরীরের যে শক্তির যথাযথ পরিচালনে আমরা জীবনের সকল বিভাগকেই সতেজ ও সবল রাখিতে সমর্থ হই, তাহার প্রতি যুবাদিগের কতই দৃষ্টিরাখা উচিত! Vitality কথাটীর উপর দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের জীবনকে কতই সাবধানে সংযমের পথে পরিচালিত করা উচিত! কেহ যদি সংযমের পথ অতিক্রম করিয়া দুর্নীতির দ্বারা বিষময় করেন, আপনার জীবনকে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে, তিনিই যে কেবল তাঁহার ফলভোগী হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তাহা নহে, তাঁহার কার্য্যের কুফল তাঁহার বংশাবলীও ভোগ করিয়া থাকে। এ সকলের দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষের সম্মুখে সততই ঘটিতেছে, কত নিরপরাধী শিশু আমাদের ব্যাধির বীজ শরীরে ধারণ করিয়া জন্মাবধি কষ্টভোগ করিয়া আমাদের উদ্দাম যৌবনের উশৃঙ্খলতার দোষ দেখাইয়া আমাদিগকে লজ্জিত করিতেছে। এই সংযমের উপর যেমন শরীরের স্বাস্থ্য, মনের ও দীর্ঘজীবন লাভ নির্ভর করে, তেমনি, শারীরিক বীরত্বের মূলও আমরা ইহার কার্য্যে দেখিতে পাই। স্পার্টা দেশে দীর্ঘ বয়সে সমর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বীরপুরুষেরা দারপরিগ্রহ করিতেন। যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া ভাল কি মন্দ, তাহা আমি কিছু বলিতেছি না,—সংযমই বীরত্বের নিয়ামক বলিয়া আমাদের স্মরণ করা উচিত। যাঁহারা দেশের হিতকল্পে আপনাদিগের জীবনকে নিয়োগ করিতে প্রস্তুত ; শারীরিক ও মানসিক বল লাভ করা তাঁহাদের কতই প্রয়োজন!—স্পার্টানদিগের ন্যায় ৫০ কি ৬০ বৎসরে বিবাহ করা উচিত, আমি বলিতেছি না। কিন্তু শরীরের শক্তি সামর্থ্য রক্ষা করিতে হইলে কথাটা বোধ হয় তত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাল্যবিবাহ কি দূষণীয় নয়? উপযুক্ত বয়সে দারপরিগ্রহের মধ্যেও শক্তিলাভের মন্ত্র নিহিত রহিয়াছে।

ছাত্রজীবনে জ্ঞানানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে যিনি পবিত্রতাকে সহায় করিয়া চলিবেন, শাকান্নের মধ্যেও তিনি উশৃঙ্খল ধনীর সন্তান অপেক্ষা শরীর মনের সুস্থতা লাভ করিয়া টেনিসন-বর্ণিত Sir Galahead এর ন্যায় বলিতে পারিবেন—

"My strength is as the strength often, Because my heart is pure."

ঐ যে ঋষিবাক্য বহু শতাব্দী ভেদ করিয়া আমাদের কর্ণকুহরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তাহা কি শিরোধার্য্য করিয়া ছাত্রগণ জীবনপথে অগ্রসর হইবে না?

"কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ম্ জিতম্।"

আমার বক্তব্য বিষয়ের শেষ সীমায় উপনীত হইলাম। ধর্ম্মই মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ বিষয়। আমাদের অজ্ঞতার দোষে আমরা উহাকে নানারূপ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া, ধর্ম্মের বিশ্ববিজয়িনী উজ্জ্বল মহানভাব কখন বিনষ্ট হইতে পারে না। কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি চন্দ্র তারার মুখ আবৃত করিয়া রাখিলেও তাহাদের কণামাত্র উজ্জ্বলতার হানি হয় না। আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ ধর্ম্মের বিকৃত আকার মানব সম্মুখে প্রকাশ করিলেও উহার ভাব কখন খর্ব্ব হয় না। এ জগতে নানারূপ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু সকল ধর্ম্মের একমাত্র প্রতিপাদ্য সেই ঈশ্বরই আদি কারণ

স্বয়ং পরমেশ্বর। ধর্ম্মমত লইয়া পৃথিবীতে অনেক বিবাদ সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু একটা স্থান আছে, যেথানে সকল ধর্ম্মাবলম্বীই সমভাবে দাঁড়াইতে পারেন।—ধর্ম্মের সেই উচ্চ উদার-ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আমরা সকলেই বলিতে প্যারি, "পরমেশ্বরের চিন্তনে হৃদয়ে শান্তি হয়, প্রাণে সৎপ্রবৃত্তির উদয় হয়,—সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের জীবন পরিচালিত করা উচিত। সেই পরমেশ্বরই ধর্ম্মের আবহ। ছাত্রজীবনে কি সেই পরমেশ্বরকে জীবনের আধার করিয়া চলা উচিত নয়? উচিত বৈ কি?—শতবার উচিত বলিলেও অধিক বলা হইল বলিয়া মনে হয় না। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতীয় শাস্ত্রের কথা এই "যুবৈব ধর্ম্মশীল স্যাৎ"—যৌবন সময়েই ধর্ম্মশীল হইবে। অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রেও আমরা দেখিতে পাই, "Remember the Lord in the days of thy youth"—যে সময়ে অন্ধমানবী ও অন্ধরাক্ষসীসমা মায়েবেন মধুর স্বরে আমাদিগকে বিপাকে ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে, সেই সময় সেই সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বরের সান্নিধ্যে সতত বাস করিতে পারিলে জীবন কি সুরক্ষিত হয় না? সকল দেশেরই ধর্ম্মাচার্য্যেরা আমাদিগকে পরমেশ্বরের পথেই বিচরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। স্পর্শমণি সংযোগে যেমন লৌহ নূতন বর্ণ ধারণ করে, সেই সত্যস্বরূপ, সেই জ্ঞানস্বরূপ, সেই পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের চিন্তনে মানবের আত্মাও সেইরূপ উজ্জ্বল জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হয়। আমি আমাদের দেশের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মাচার্য্যদিগের সকল পথ অবলম্বন করা শ্রেয় বলিয়া মনে করি না; কিন্তু তাঁহাদিগের ভগবদ্ভক্তি ছাত্রদিগের অনুকরণীয়। আমরা, সকলেই ছাত্রই দেখিতে ইচ্ছা করে, যিনি এই কথা বলিতে পারেন, "প্রভো! কি হবে সে জ্ঞানে, যা'তে তোমারে না পাই।"

যেমন একঘণ্টা ব্যায়ামের দ্বারা আমরা শারীরিক বল লাভ করিয়া শরীরকে অধিকক্ষণ কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিতে পারি, সেইরূপ, ক্ষণকাল পরমেশ্বরের সহবাস ও প্রার্থনাদ্বারা আমরা হৃদয়ে শান্তি ও বল লাভ করিয়া জীবন পথে অধিকতররূপে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই। ইটালীর উদ্ধারকর্ত্তা জোসেফ ম্যাটসিনী প্রার্থনা করিয়া সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, তাঁহার ঈশ্বর-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলে তাঁহাকে কেবল ইটালীর উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে ইচ্ছা হয় না, তাঁহাকে ধর্ম্মাচার্য্যের পদে স্থান দান করিতে বাসনা হয়।

সৌভাগ্য ক্রমে ভারতে নবালোক দেখা দিতেছে। ভারতবাসীরা ভারত-জননীর সর্ব্ববিধ অভাব মোচনের জন্য, বহুদিনের আলস্য ও জড়তা পরিহার করিতে তৎপর হইতেছেন। এ সময় ছাত্রবৃন্দ কি উদাসীন থাকিবেন? এ কথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। এ কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর শৌর্য্য বীর্য্যের যদি কিছু পরিচয় অন্য জাতি পাইয়া থাকেন, সে কেবল ছাত্রদিগেরই গুণে, তবে রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁহারা কত সময় ব্যয় করিবেন, এবং কিরূপে কার্য্য করিবেন, এ বিষয়ে দেশের অগ্রণীদিগের উপদেশ গ্রহণ করিয়াই তাঁহাদিগের চলা আবশ্যক। রাজনীতিক আন্দোলনকারীদিগের 'বৈরনির্য্যাতনের ভাবকেই,' একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া মনে করা উচিত বলিয়া বোধ হয় না। তবে কাউণ্ট টলষ্টয়ের মতই যে সকল সময়ে প্রাচুর্য্য, তাহাও ঠিক

বলিয়া বোধ হয় না। কাউণ্ট টলষ্টয় যীশুর doctrine of non-resistance এর মতটা পূর্ণ মাত্রায় পালন করাই বিধেয় মনে করেন। কোন বিষয়ে বল প্রয়োগ—কোন স্থলে রক্তপাত তাঁহার মতের বহির্ভূত। মহাত্মা শাক্যমুনি ও চৈতন্য এইরূপ মতই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ ভারত ক্ষমা-কেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, কাউণ্ট টলষ্টয় যেমন রুসিয়ার চিন্তাশীল ধর্ম্মাচার্য্য, থিওডোর পার্কারও আমেরিকা দেশের একজন সামান্য চিন্তাশীল ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবনের একটী ঘটনার বিষয় এখানে উল্লেখ করিতেছি। যখন আমেরিকা দেশে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন একজন ক্রীতদাস রাত্রে প্রভুর বাটী হইতে লুকাইয়া থিওডোর পার্কারের বাটীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। পার্কার তখন দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধেই প্রবন্ধ রচনা করিতেছিলেন। পার্কার আপন বাটীতে তাঁহাকে আশ্রয় দান করিলেন। এবং তাঁহার হস্তে একখানে বাইবেল ও একটী পিস্তল দিয়া এই কথা বলিলেন, বাইবেলখানি দ্বারা আত্মাকে রক্ষা করিবে, এবং পিস্তলের দ্বারা নিজ দেহকে রক্ষা করিবে, অর্থাৎ কেহ যদি তোমায় ধরিতে আইসে, ইহার দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিবে, এই বলিয়া তিনি সেই পালক ক্রীতদাসের কোন স্বাধীন ভূমিতে পলাইবার ব্যবস্থা করিয়াদিলেন। এই এক দৃষ্টান্ত। দেহ ও মন ভগবানেরই দান, অতএব দুইয়েরই স্বাধীনতা ও পবিত্রতা রক্ষা আবশ্যক।

দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি ছাত্রদিগের উপরই অধিকতর রূপে নির্ভর করিতেছে। যেমন মহাবীর আলেকজাণ্ডার গ্রীক-বীর একিলিসের বীরত্ব চিন্তা করিয়া বীরত্ব উপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন; তেমনি, উন্নতিশীল ছাত্রেরা, জ্ঞানী, শারীরিক বলে বলীয়ান ও ধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগের মহৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া শরীরের বলে ও ধর্ম্মে বলীয়ান হইয়া নিজের, নিজ পরিবারের ও দেশের হিতসাধনে যত্নবান হইবেন, ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশশিভূষণ বসু।

পাষাণ।

(১)

একদিন ছিলে তুমি কোমলতাময়;
একদিন যাইত গলিয়া
অশ্রুতে ও প্রাণ;
আজি যেন নিদ্রালসে নিঃস্ব নিরাশ্রয়,
বিদেশীর পদপ্রান্তে পড়িছ ঢলিয়া
হইয়া পাষাণ।

২

বিখণ্ডিত বিমলিন ধূলি ধূসরিত
রাজবর্ত্মে হেরিয়া তোমায়—
জড় অচেতন,
অকস্মাৎ শুনি প্রাণে বাল্মীকি সঙ্গীত,
হেরে স্মৃতি অহল্যার অভিশপ্ত কায়,—
অতীত স্বপন।

৩

মনে হয়, হেথা যেন ফিরিবে রাঘব,
ফিরিবে সে পুণ্য ত্রেতা যুগ
অবতার সাথে,
পুনঃ পদস্পর্শে লয়ে বিগত গৌরব
কোন্ গরীয়সী দেবী হবে জাগরূক
বিমুক্ত প্রভাতে?

৪

লুক্কায়িত শত প্রাণ আছে দেহ ভরি,
স্নেহ-প্রীতি-কুসুম-কোমল,
শাপান্তে আবার,—
কে জানে তুমি যে কভু সিংহাসনোপরি,
নব হর্ষে ধরাপ্রান্তে সজীব সচল
দাঁড়াবে না আর?

৫

ভারতের প্রতি দেব মন্দির মাঝারে,
আজো দানে পাষাণ মূরতি
বর আশীর্ব্বাদ,
তুমি ও মা জেগে উঠ উষার আঁধারে
আনিয়াছি অস্তিমের প্রাণের আরতি,—
বিজয় সংবাদ।

(৬)

তোমার মাঝারে আছে অনুতাপ সাথ
অবরুদ্ধ কত অশ্রুজল,
উৎসের মতন;
টেনে ফেলে দেব তার কটোর সম্পাত
—মরুবক্ষে নিয়ত তা' করি কল্ কল্
হউক পতন।

(৭)

চল আপনারে নিয়ে বিরলে বিজনে;
বিজাতীয় হীন ধূলি-মগ্ন
রবে কত কাল?
অসার জীবন গুলি নিভৃতে গোপনে
কত দিন অনঙ্কুর পড়ে র'বে নগ্ন
বেরি' বক্ষ ভাল?

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

সাধু কালীকান্ত।

বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব্ববাঙ্গালায় সে সমস্ত স্বনামধন্য মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছে, আমাদের আলোচ্য এই মহাত্মাও তন্মধ্যে এক জন। ইনি পুলিশ বিভাগে কর্ম্ম করিয়াও "সাধু" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। পুলিশ কর্ম্মচারী হইয়াও ইহাঁর ভাগ্যে যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে, তাহা অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না। আজ আমরা এই মহাত্মার আদর্শ জীবনের একটী সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এ প্রবন্ধে প্রকাশ করিব।

পূর্ব্বের বিবরণ।

প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের যে শাখা পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাঙ্গালী বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন, মহাত্মা চন্দ্রশেখর উপাধ্যায় তাঁহার আদি পুরুষ। চন্দ্রশেখর "পণ্ডিত চক্রবর্ত্তী" এই উপাধিতে বিভূষিত হইয়া মিথিলারাজের সভাপণ্ডিতের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সেই হইতে "চক্রবর্ত্তী" ইহাঁদের বংশপরম্পরা উপাধি। মিথিলা রাজ্য মুসলমানের হস্তগত হইলে, চন্দ্রশেখর বঙ্গে আগমন করিয়া মুরশিদাবাদে স্বীয় আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। পরবর্ত্তী সময়ে এই মহাত্মার বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে

রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামই বিশেষ রূপে উল্লেখ-যোগ্য। তিনিও অল্প বয়সে "ব্যাসাচার্য্য" উপাধি লাভ করিয়া তাৎকালিক পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

রাজনগরের মহারাজা রাজবল্লভ মুরশিদাবাদে কিরীটকোণ নামক যজ্ঞ সম্পাদন করেন। এই অনুষ্ঠানে ব্যাসাচার্য্য মহাশয়কে হোতার কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। ব্যাসাচার্য্য মহাশয়ের কর্ম্মকুশলতা ও পাণ্ডিত্য দর্শনে একান্ত ভক্তিভাবাসন্ন হইয়া রাজবল্লভ তাঁহাকে রাজনগর লইয়া আসেন। ব্রহ্মোত্তর জমী প্রদান করিয়া ও পঞ্চমী দেবী নামক একজন শ্রোত্রিয়ের কন্যা সম্প্রদান করিয়া আকশা গ্রামে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। কালে তিনটী পুত্র লাভ করিয়া ব্যাসাচার্য্য মহাশয় পরলোক গমন করিলে, সাধ্বী পঞ্চমী দেবীও পতির জ্বলন্ত চিতারোহণ করিয়া পতিভক্তির চূড়ান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ব্যাসাচার্য্য মহাশয়ের মধ্যম পুত্র রামজয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও একজন সংস্কৃতজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজ বাটীতে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু পাণ্ডিত্য গৌরবে নহে, সাধুতা, পরোপকার, নিষ্ঠা প্রভৃতি পৈত্রিক বহু গুণেরই অধিকারী হইয়া জনসমাজে সম্মান ও ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন।

রামজয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়, মাধবচন্দ্র, কমলাকান্ত, রঘুনাথ, কালীনাথ ও স্বরূপচন্দ্র নামে যে পাঁচটী পুত্রের অধিকারী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চতুর্থ এই কালীনাথই আমাদের আলোচ্য কালীকান্ত। পরবর্ত্তী সময়ে ইনি কালীকান্ত নামে বিশেষ রূপে প্রসিদ্ধ হইলেও কালীনাথই ইহাঁর পিতৃ মাতৃ প্রদত্ত প্রকৃত নাম।

জন্ম ও শিক্ষা।

বঙ্গাব্দ ১২২০ সনের ১৪ই আশ্বিন তারিখে, বিক্রমপুর আকশা গ্রামে * কালীকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। জন্মিয়া কালীকান্ত পিতা মাতার স্বচ্ছলাবস্থা দেখেন নাই, অতি শিশুকালেই দারিদ্র্য দুঃখে পতিত। রামজয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল ছিল না। যে সমস্ত ব্রহ্মোত্তর জমী ছিল, তাহা হইতেই নিজ সংসারের ও চতুষ্পাঠীর ব্যয় স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইত। কালীকান্ত জন্মগ্রহণ করার কিছু পরেই হঠাৎ গৃহদাহ হইয়া, গৃহস্থিত তাবত সামগ্রী ও জমীর দলিলাদি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল। দেশের মধ্যে সুশাসন একেবারেই নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয় সে সকল জমী আর উদ্ধার করিতে পারিলেন না। চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণকে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়া, অতি কষ্টে কাল কর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কালীকান্তের প্রাথমিক শিক্ষা তাৎকালিক প্রথানুসারে গ্রাম্য পাঠশালাতেই হয়। শিশুকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও দৃঢ় অধ্যবসায় ছিল। যাহা কর্ত্তব্য বোধ করিতেন, তাহা সম্পাদন করিতে বিন্দুমাত্র ক্রটী করিতেন না। অতি অল্পকাল মধ্যেই কালীকান্ত বাঙ্গালা শিক্ষা সমাপন করিয়া, সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করেন। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষা তিনি আর সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। দরিদ্রতার কষাঘাতে পীড়িত হইয়া, কিছুদিন

* এই আকশা গ্রাম এখন ফরিদপুর জেলান্তর্গত পালং থানার অধীন। পূর্ব্বে ঢাকা জেলান্তর্গত ছিল।

অধ্যয়নের পরেই ঢাকায় আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঢাকাতে আত্মীয় স্বজন কিম্বা সাহায্যকারী বন্ধু বান্ধব কেহই নাই। এমতাবস্থায় ঢাকা আসিয়া, তিনি প্রথম অতিশয় কষ্টে পতিত হন। কিন্তু ভগবানের কৃপাতে সে কষ্ট তাঁহার অধিককাল ভোগ করিতে হয় নাই। এই সময় বিক্রমপুর বেতকা-নিবাসী স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র বসু মহাশয় ঢাকাতে ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। তিনি বহুতর দরিদ্র ভদ্র সন্তানের প্রতিপালন করিতেন। কালীকান্তের দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া, তিনি তাঁহাকে নিজ বাসায় আশ্রয় দিলেন ও গ্রাসাচ্ছাদনের ভার গ্রহণ করিলেন।

ডিপুটী বাবুর বাসায় থাকিয়া কালীকান্ত পার্সী ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। যে সময় কালীকান্ত এই শিক্ষা আরম্ভ করেন, সে প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে সময় এদেশে ইংরেজী ভাষার তাদৃশ আদর ছিল না। আর কলিকাতা ভিন্ন অন্যত্র ইংরেজী শিক্ষা করার তাদৃশ সুবিধাও ছিল না। রাজকীয় যাবত কার্য্য পার্সী ভাষাতেই সম্পাদন হইত।

বৈষয়িক জীবন।

১২৪৪ সনে গবর্ণমেণ্ট সেটেলমেণ্ট আফিসে পাঁচ টাকা বেতন কালীকান্ত প্রথমে মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, অল্পকাল মধ্যেই দশ টাকা বেতনে মহাফেজের পদে উন্নীত হ'ন। সাধুতা ও কার্য্যতৎপরতা তাঁহার জীবনের প্রথম হইতেই ছিল। দরিদ্রতার কশাঘাতে কালীকান্ত পৈত্রিক ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এত প্রকারের অভাবগ্রস্ত হইয়াও পরিশ্রমলব্ধ এই পাঁচটী টাকা স্থির উপরি পাওনার প্রতি তাঁহার ঘৃণা। ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী, তাঁহার এই প্রকার ভাব,—ক্রমে কথাটা মাজিষ্ট্রেট আর এবারক্রম্বি সাহেবের কর্ণগোচর হইল। এই প্রকার লোককে পুলিশ বিভাগে আনিলে মঙ্গল হইবে, মনে করিয়া তিনি কালীকান্তকে ফৌজদারীর নায়েব-নাজিরী কার্য্য প্রদান করেন। ক্রমে একশত টাকা বেতনে জিলার প্রথম শ্রেণীর দারোগা পদে কালীকান্ত উন্নতি লাভ করেন।

সেকেলে পুলিশ।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, যে সময় কালীকান্ত পুলিশ বিভাগে কার্য্য আরম্ভ করেন, সে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে সময়ের পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে বর্ত্তমান সময়ের লোকে "সেকেলে পুলিশ" বলিয়া অভিহিত করেন। শুধু পুলিশ বিভাগ বলিয়া নয়, অন্যান্য বিষয়েও সে সময়ের সহিত বর্ত্তমানে অনেক পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছে।

তখন পুলিশের ঘুষ খাওয়া, তত নিন্দার বিষয় ছিল না। শুধু পুলিশ কেন, ডিপুটী মুন্সেফ প্রভৃতি হাকিমগণের মধ্যেও তৎকালে অনেকে ঘুষ গ্রহণ করিতেন। লোকের সংস্কার ছিল,—অর্থ উপার্জ্জনের সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কোন প্রকারে অর্থ হস্তগত করিতে পারিলেই হয়, তা যে ভাবেই হউক। তবে ব্যয়ের সময় সদ্ব্যবহার চাই। দোল, দুর্গোৎসব, পিতৃ মাতৃ-শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কার্য্যে বহু ব্যয় করিয়া যশস্বী হওয়াই, তখনকার দিনে জীবনের বিশেষ সার্থকতা ছিল। তাই, তিন টাকা বেতনে চাকুরী করিয়াও বহুলোকের ভরণ-পোষণ, মঠ প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী উৎসর্গ প্রভৃতি

কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, এই দৃষ্টান্ত সে দিনে বড় বিরল ছিল না।

পুলিশ চিরদিনই অত্যাচারী, তখনও ছিল, এখনও আছে। কোন স্থানে তদন্ত উপলক্ষে উপস্থিত হইলে, কিছু আদায় করিয়া আনা, তখনকার দিনে যেমন একটা অবশ্য দাবীর মধ্যে ছিল, পুলিশের সে দাবী এখনও আছে। তবে সেকেলে পুলিশের উৎকোচ গ্রহণ ও অত্যাচার করিবার সুবিধা যেমন ছিল, এখন তেমন নাই। গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে পুলিশ বিভাগের বহুল সংস্কার করিয়াছেন। পুলিশের ক্ষমতা এখন অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। দেশের লোক শিক্ষিত। ঘরে ঘরে উকীল মোক্তার, ঘরে ঘরে ডিপুটী মুন্সেফ। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি সংবাদ পত্র রহিয়াছে। পুলিশ কোন অন্যায় কার্য্য করিলে, সে বিষয় উদ্ধতন কর্ম্মচারী ও জন সাধারণের মধ্যে প্রচার হইতে এখন আর অধিক বিলম্ব হয় না। এত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও বর্ত্তমান সময়েও পুলিশ যে প্রকার অত্যাচার করে, তাহা দৃষ্টে "সেকেলে পুলিশ" যে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর অত্যাচারী ছিল, ইহা সহজেই অনুমান হয়। তখন দেশের মধ্যে সংবাদ পত্র ছিল না। কাজেই পুলিশ কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাহা প্রকাশ হইত না। লোকে জানিত পুলিশই, একমাত্র হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। শত প্রকার অত্যাচার হইলেও, পুলিশের বিরুদ্ধে যাইতে গ্রাম্য লোকের মধ্যে আর কাহারও সাহস হইত না। তদন্ত উপলক্ষে কাহারও বাটীতে উপস্থিত হইলে, সে বাটীতে মস্ত একটা ধুমধাম পড়িয়া যাইত। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়াদি খাদ্য দারোগা বাবুর রসনা তৃপ্তির জন্য গৃহস্বামীকে ব্যস্ত হইতে হইত। ভোজন-দক্ষিণার ব্যবস্থাও অনেক উন্নত প্রণালীর ছিল। এখনকার মত সংক্ষেপে হইত না। আজ কাল দারোগা বাবুর ক্ষিপ্রহস্তে স্বীয় পকেট পূর্ণ করিবার প্রাণপণ প্রয়াস পাইলেও, একত্র এক সহস্র মুদ্রা দর্শন অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু তখনকার দিনে "হাজার টাকা উৎকোচ" বড় একটা বেশী কথা ছিল না।

অবশ্য অপেক্ষাকৃত হৃদয়বান লোক যে তখন পুলিশ বিভাগে না ছিল, এমন নহে। যাঁহারা মিথ্যার সম্পূর্ণ প্রশ্রয় না দিয়া, ন্যায় পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক, সে পক্ষ হইতেই যে কিছু পূজা গ্রহণ করিয়া, ন্যায্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, অথবা যাঁহারা নিম্নপদে অবস্থান সময়ে উৎকোচ গ্রহণ করিলেও দারোগাপদে উন্নীত হইয়া আর উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই, বেশ সাধুভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তৎকালে তাহারাই প্রশংসিত পুলিশ কর্ম্মচারী বলিয়া জন-সমাজে যশস্বী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানেও পুলিশ বিভাগে যাঁহারা যশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী অন্বেষণ করিলে, এই প্রকার অবস্থাই প্রায় দৃষ্ট হয়। জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সাধুভাবে জীবন যাপন, চিরদিনই বড় দুর্ল্লভ। সেদিনেও যেমন দুর্ল্লভ ছিল, এখনও তেমন দুর্ল্লভ। আর দুর্ল্লভ বলিয়াই কালীকান্তের এত যশ, এত প্রতিষ্ঠা।

কালীকান্তের সাধুতা।

দরিদ্রের সন্তান কালীকান্ত পাঁচ টাকা বেতনে যখন দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'ন, তখনও আমলা-জন-সুলভ হস্ত প্রসারণ কার্য্য ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। শত প্রকারে অভাবগ্রস্ত হইয়াও উপরি পাওনার প্রতি

ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আজ কালীকান্ত জেলার প্রধান দারোগা। উপঢৌকন বা উৎকোচ-স্বরূপে তাহার নিকট সহস্র সহস্র মুদ্রা উপস্থিত হইতেছে। কালীকান্ত তাহা মল মূত্রের ন্যায় ঘৃণার চক্ষে পরিত্যাগ করিতেছেন। তদন্ত উপলক্ষে মফঃস্বল কাহারও বাটীতে যাইতে হইলে আহার্য্য তাবৎ সামগ্রী সঙ্গে লইয়া যাইতেন। মোকদ্দমা সংস্পৃষ্ট কাহারও বাটীতে পান, তামাক খাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ আপত্তিজনক ছিল।

এই সাধু ব্যবহারের বিষয় ক্রমশঃ জনসমাজে প্রচার হইতে লাগিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের এই নির্লোভতা দেখিয়া সকলেই ধন্য ধন্য কবিতে লাগিলেন। তখন ভিক্ষুকেরা পর্য্যন্ত তাঁহাব চবিত্রেব গুণানুবাদ করিয়া দ্বারে দ্বারে গান করিত—

ধন্য কালীকান্ত যাঁহার গুণের অন্ত
করা কিছু নাহি যায়।
যিনি হাজাবে হাজার বিস্‌ফত কতবাব
ঠেলিয়া ফেলিলেন পায়॥
দেখ, জঘন্য নগণ্য আমলা কতজন
ঘুষ খেয়ে সদা কাজ কবে।
বাবু পুরীষ সমান এই সব জ্ঞান
করিতেন নিরন্তরে॥
দেখ, দশ মুদ্রা বেতনে কত অভাজনে
পাকা দালান গড়িতেছে।
বাবু এত মোশরায় খেড়ী সমুদয়
যেম্‌নি প্রায় তেম্‌নী আছে॥

তখন কোন কঠিন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, তদন্তের ভার যেন কালীকান্তকে দেওয়া হয়,—এই প্রার্থনা করিয়া ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট লোকে দরখাস্ত করিত। কালীকান্তের চরিত্রের বিষয় ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণও সবিশেষ অবগত ছিলেন। লায়েল, অফ্-বি-সিম্‌সন্, আর-এবারক্রম্বি, রামপেনী, চার্লস, পর্ছি, এ-এবারক্রম্বি, জর্জ গ্রেহাম প্রভৃতি কমিশনার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট সকলেই কালীকান্তকে সাধু ও প্রধান ডিটেক্‌টিভ্ কর্ম্মচারী বলিয়া প্রশংসা করিতেন।

ডিটেক্‌টিভ্ কালীকান্ত।

কমিশনার লায়েল্ মহোদয় কালীকান্তকে বিচাবপতির (Deputy Magistrate) পদে উন্নীত করিবেন, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, তাহার আয়োজন করিতেছিলেন; কিন্তু ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে কালীকান্তের ডিপুটীর পরিবর্ত্তে ডিটেক্‌টিভের পদ লাভ ঘটিল। এই সময় লেপ্টানেণ্ট গবর্ণর সাব উইলিয়ম গ্রে বাহাদুর পরিদর্শনার্থে ঢাকাতে আগমন করেন। তিনি কালীকান্তেব কৃতকার্য্যের ও সাধু চবিত্রের বিষয় অবগত হইয়া, "এই প্রকাব লোককে পুলিশ বিভাগে রাখাই ভাল, তাহাতে দেশের বহু প্রকাবে মঙ্গল হইবে, অথচ ইহার উন্নতিও বাঞ্ছনীয়" এই উভয় দিক বক্ষা করিয়া ডিপুটীর পরিবর্ত্তে দুই শত টাকা বেতনের ডিটেক্‌টিভেব পদ প্রদান করেন। সেই সময় পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ডিটেক্‌টিভ বিভাগ C. I D. সৃষ্টি হয় নাই। কালীকান্তই সর্ব্ব প্রথমে ডিটেক্‌টিভের পদ লাভ করিয়াছিলেন।

এই হইতে কালীকান্তকে আর পুলিশের পোষাক পরিধান করিতে হয় নাই, সাধারণ কোন তদন্তে যাইতে হয় নাই। জাল, জুয়াচুরী, খুনী, ডাকাতী প্রভৃতি কঠিন কঠিন তদন্ত, যাহা অপর কোন কর্ম্মচারী দ্বারা নিষ্পত্তি হইত না, সেই সকল স্থলে যাইতে হইত। তদন্ত করিয়া সত্য নির্ণয় করিবার শক্তিও কালীকান্তের যথেষ্ট ছিল। কৃতকার্য্যতার জন্য পুরস্কার স্বরূপে গবর্ণমেণ্ট

হইতে যে সমস্ত মুদ্রা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বসাকুল্যে প্রায় বিংশ সহস্রেরও অধিক হইল।" ফকির, চাষা, বৈষ্ণব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ করিয়া যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক সত্য নির্ণয় করিতেন, তাহা বস্তুতই বড় কৌতুহলোদ্দীপক। সময়ান্তরে তাহার দুই একটী ঘটনার অবতারণা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মহা পরীক্ষা।

তখন দেশের মধ্যে ছোট বড় সকলেই বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, কালীকান্ত যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন. কমিশনার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির নিকট তাহা সম্পূর্ণ- সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে। এমন কি, দাওরার বিচারের ফলও কালীকান্তের মতামতের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এজন্য বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি মাত্রেই কালীকান্তকে স্বপক্ষে রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। ধনিগণ, দশ হাজার, বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত উপস্থিত করিতেন। একবারে পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা কালীকান্তের নিকট উপস্থিত, এমন ঘটনাও কয়েকবার ঘটিয়াছে।

ধন্য কালীকান্ত! ধন্য তাঁহার হৃদয়ের বল। যে অর্থের প্রলোভনে মুনির মন পর্য্যন্ত প্রলুব্ধ হয়, রাজকীয় উচ্চ বিচারাসন পর্য্যন্ত কম্পিত হয়, আজ সেই অর্থের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে সাধুতার আদর্শ দেখাইলেন, তাহা আর কেহ বিস্মৃত হইতে পারিবে না। তাঁহার এই সাধুচরিত্র প্রসঙ্গ বাঙ্গালার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিনের জন্য স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

কালীকান্তের চরিত্র।

কালীকান্ত চরিত্রবান লোক ছিলেন। অহঙ্কার কাহাকে বলে,তাহা তিনি জানিতেন না। পরোপকার ভিন্ন, জীবনে, কাহারও কখনও অনিষ্ট চিন্তা করেন নাই। কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিও সাধ্যানুরূপ সদ্ব্যবহার করিতেন। ভারত-সাম্রাজ্যেশ্বরীর রাজত্বে দোষী ব্যক্তি অব্যাহতি পাউক, কিন্তু একজন নির্দ্দোষীও যেন দণ্ডিত না হয়, এই ভাব মনে রাখিয়া সর্ব্বদা কার্য্য করিতেন। এই সমস্ত কারণে দেশের ছোট বড় সকলেরই তিনি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ঢাকার নবাব স্বর্গীয় আব্দুল গণি, কে-সি-এস-আই, জয়দেবপুরের রাজা স্বর্গীয় কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর, ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর, শ্রীনগরের বাবু, মুড়াপাড়ার বাবু প্রভৃতি এতদ্দেশীয় সমস্ত জমিদারগণের সঙ্গেই তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল।

কালীকান্ত নিজে দরিদ্রের সন্তান, জীবনের প্রারম্ভে দারিদ্র্য দুঃখ বিশেষরূপ ভোগ করিয়াছিলেন। দীন দুঃখী দেখিলে সে কথাটা তাঁহার স্মরণ হইত। কোন দরিদ্র সন্তান সাহায্যার্থী কিম্বা কার্য্যাপ্রার্থী হইয়া আসিলে পার্য্যমানে তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। কাহাকে বা নিজে আর্থিক সাহায্য করিয়া, কাহাকে বা কার্য্যের সংস্থান করিয়া দিয়া উপকার করিতেন। পাঠার্থী অনেক দরিদ্র সন্তানকে বাসায় রাখিয়া ভরণ পোষণ করিতেন। এজন্য জীবনে কিছুমাত্র অর্থ সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই, আর তাহার প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। —"ন্যায়ার্জিত ধনোৎসর্গো সদ্ভঃসিদ্ধ্যেৎ কলৌ পরম্।"—এ কথাটী সর্ব্বদাই আবৃত্তি করিতেন। নিজ জীবনে ইহারই একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন।

শেষ জীবন।

১২৮৫ সনে কালীকান্ত ৪১ বৎসর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কার্য্য করিয়া, ৬৫ বৎসর বয়সে, কার্য্য হইতে অবসর ও পেনসন গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি আর এদেশে বেশী দিন ছিলেন না। তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে যাঁহারা সমৃদ্ধিশালী, তাঁহারা অনেকেই তাঁহাদের জমীদারীর ম্যানেজার হইয়া থাকিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করেন নাই। বৈষয়িক ব্যাপার হইতে দূরে থাকিয়া পরমার্থ চিন্তার জন্য পেনসন নেওয়ার কয়েক মাস পরেই কাশীধাম চলিয়া যা'ন।

জীবনের অবশিষ্ট বিশ বৎসর কাল কাশীধামেই অতিবাহিত করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি একবার তীর্থ-পর্য্যটন উপলক্ষে অযোধ্যা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। আর বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে বহুলোকের অনুরোধে, মাত্র কয়েক দিবসের জন্য ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আর এক দিনের জন্যও তিনি পুণ্যভূমি কাশীধাম পরিত্যাগ করেন নাই।

একমাত্র পুত্র তরণীকান্ত তখন নাবালক। সংসারে উপার্জ্জনশীল আর কেহই নাই। তাই পেনসনের টাকা হইতে অর্দ্ধাংশ সাংসারিক খরচের জন্য ঢাকায় পাঠাইতেন। বক্রী অর্দ্ধাংশ হইতে নিজের গ্রাসাচ্ছাদানোপযোগী যৎসামান্য রাখিয়া অবশিষ্ট দীন দুঃখীগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। নিরপেক্ষ ও নির্লোভ বলিয়া কাশীধামেও তাঁহার বিলক্ষণ সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল।

বিংশ বর্ষ কাল কাশী বাস করিয়া ১৩০৫ সনের ১৬ই বৈশাখ তারিখে কালীকান্ত ৮৫ বৎসর বয়সে স্বর্গধাম গমন করেন। মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তাঁহার শরীরে বেশ শক্তি সামর্থ্য ছিল। দেবদর্শন উপলক্ষে প্রতিদিন প্রায় এক ক্রোশের পথ পরিভ্রমণ তাঁহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল। কালীকান্ত অর্থপ্রয়াসী ছিলেন না, কিন্তু বিধাতার বিধানে পেনসন হইতেও তাঁহার যে অর্থ লাভ হইয়াছিল, তাহার সংখ্যাও চব্বিশ সহস্র মুদ্রা। বলাবাহুল্য এত দীর্ঘকাল পেনসন ভোগ অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না।

পরিশিষ্ট।

এই নশ্বর সংসারে ধন, জন, জীবন, যৌবন সকলই অস্থায়ী। একমাত্র কীর্ত্তিই অবিনশ্বর। কালীকান্ত এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অবিনশ্বর যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন,তাহা চিরদিন অক্ষয় থাকিবে। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, আজও তাঁহারা তাঁহার জন্য অশ্রু-বিসর্জ্জন করেন। আর যাঁহারা তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহারাও লোক পরম্পরায় তাঁহার সাধু আখ্যা শ্রবণ করিয়া, ভক্তিপ্রণত চিত্তে কালীকান্তের উদ্দেশে প্রণিপাত করেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বিগত ১৩০৭ সনের মাঘ মাসের প্রদীপ পত্রিকাতে প্রদীপ-সম্পাদক মহাশয় এই মহাত্মার একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলেন। অদ্য আমরাও তাঁহার সাধু জীবনের প্রসঙ্গ একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিলাম। মহাত্মা কালীকান্তের সুযোগ্য পুত্র পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী সরস্বতী মহাশয় সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। নব্যভারত, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকাতে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্য ও বঙ্গীয় প্রাচীন কবি সম্বন্ধে

আলোচনা করিয়া, অল্পকাল মধ্যে বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। আশা করি, তিনি তাঁহার পিতৃদেবের একটী বিস্তৃত জীবনী প্রকাশ করিয়া, সকলের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

মানব সমাজ।(১)

১৩১৫—এই শুভ বৎসরের পূর্ব্বে মনে ধারণা করিতেই পারিতাম না যে,চিরদাসত্বের সমর্থনের নিমিত্ত একটা ন্যায়শাস্ত্র প্রণীত হইতে পারে। কোন স্বনামবিখ্যাত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতেছেন, তাহা হইতেই প্রথম বুঝিতে পারি যে, আবশ্যক হইলে ওরূপ শাস্ত্রও রচনা করা যায়। মনুষ্যের সাধ্যাতীত কিছুই নাই। প্রথম প্রথম প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা হইতও এবং করিয়াছিও। কিন্তু এখন আর সে ইচ্ছা নাই। কেবল কয়েকটী স্থূল কথার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

সমাজ পদার্থটা বুঝা বড়ই কঠিন। ব্যক্তির সমষ্টিতেই সমাজ। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। ঐ সমষ্টি অপেক্ষাও সমাজ আর একটু বেশী।* সমাজ বুঝিতে হইলে ব্যক্তিকে বুঝা আগে আবশ্যক। কোন নির্দ্দিষ্ট মানব সমাজকে পরিচালন করিতে ঐ সমাজস্থ ব্যক্তিকে চিনা চাই, তাহাকে ব্যক্তি হিসাবে তো চিনা চাই-ই, জীব হিসাবেও চিনিতে হয়। সমাজ যেমন মানুষের আছে, তেমনই অনেক ইতর জীবেরও আছে, মানব ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে ইতর জীব হইতেই জাত হইয়াছে। তাই মানুষকে চিনিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণকে অর্থাৎ ইতর জীবদিগকেও চিনা চাই। মানুষকে বিশ্ব হইতে পৃথক করিলে বুঝা যাইবে না। দেহে ও মনে মানুষ সমস্ত জীবের উত্তরাধিকারী,সে দেহ ও মনে পৃথিবীর ও জগতের সমস্ত পরিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত প্রতিঘাত বহন করিতেছে। সে বিশ্বের সহিত এক সূত্রেই গ্রথিত। তাই তাহাকে চিনিতে হইলে জীব জড় সমস্ত জগতের অংশ রূপেই চিনিতে হয়। পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় নাই। জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান,—এ তিনের সম্যক আলোচনার পর মানবকে কিছু কিছু চেনা যাইতে পারে। এবং ব্যক্তিকে চিনিবার পর সমাজকে চিনিবার কিছু কিছু আশা করা যায়।

মানব-সমাজ বুঝা এত কঠিন। ইহাকে এক অর্থে মহাকাব্য বলিলেও কেবল কবিকল্পনার সাহায্যে ইহাকে বুঝা যাইতে পারে না। উপরে যে ত্রিবিধ বিজ্ঞানের কথা বলিলাম, উহাদিগকে এক কথায় প্রকৃতি বলা যায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেরূপ ভাবে পরিজ্ঞাত থাকিলে মানবকে এবং মানব সমাজকে বুঝা যায়, সকল দেশেই সমাজের নেতৃগণ তাহা জানেন না। কিন্তু জীব-বিজ্ঞান না বুঝিয়া মানবকে বুঝিবার চেষ্টা করা একবারেই অসম্ভব। ইহা নেতৃগণ বুঝেন না, এবং জানেনও না।* মানুষের বিষয় সকলেই চিন্তা করে এবং মানব সমাজের বিষয়

* J. A. Thomson's Heredity.

* Ray Lankester, Kingdom of Man, p48.

সকলেই ভাবে। কিন্তু প্রকৃত রূপে ভাবিবার উপযোগীতা কয়জনের আছে? এ সম্বন্ধে সন্দেহ শূন্য মত দিবার অধিকার বোধ হয় কাহারই নাই। কিন্তু যে রোগের প্রতি-বিধানে বহুদর্শী সুপণ্ডিত চিকিৎসক হতবুদ্ধি হইয়া যান, হাতুড়িয়া-বৈদ্য তাহা নিশ্চয় আরাম করিতে পারে বলিয়া অবপটে দ্বিধা-শূন্য ভাবে প্রচার করিয়া থাকে। যে যত জ্ঞানে কম, যে যত বুঝে কম, সে ততই দৃঢ় মত পোষণ করে। জগতে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।

কোন কথাই বলা যায় না। কিন্তু প্রায় সকল সমাজের নেতৃগণই স্বরচিত বিধি-নিয়মের উপর এতদূর আস্থাবান যে, সকল কথাই নিশ্চিত রূপে বলিতে সাহসী হন, সকল বিধিই দৃঢ়তার সহিত অনুষ্ঠান করিতে সাহসী হন। জীব বিজ্ঞান, এমন কি, মানব তত্ত্ব পর্য্যন্তও জানিবেন না, অথচ মানব সমাজ পরিচালন করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন। মানব সমাজ খেলা করিবার সামগ্রী নহে। ইহার এক দিকে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিলে শত দিকে অভাব-নীয়, অচিন্তনীয় ফল উৎপন্ন হয়। সে সমস্ত চিন্তা করা, সে সমস্ত ধারণা করা এক-বারেই অসম্ভব। স্পেন্সার দেখাইয়াছেন যে, ইংরেজ সমাজে সুরাপান নিবারণের চেষ্টা করায় নরহত্যা রূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। দরিদ্রের অন্ন সংস্থান করিতে গিয়া দারিদ্র্যকে আরও বাড়াইয়া তুলা হইল, তাহার উপর স্থানে স্থানে ব্যভিচার দোষ উৎপন্ন করা হইয়াছিল। এমন যে সদনুষ্ঠান, তাহারও ফল কতদূর বিষময় হইল! ইহা কি পূর্ব্বে কেহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন? এতদ্দেশে জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথমে কত সামাজিক মঙ্গল সাধন করিয়াছিল; কিন্তু আজি কে অস্বীকার করিতে পারেন যে, সেই মঙ্গল হইতেই কত অমঙ্গল সঞ্জাত হইয়াছে? এক দিকে বঙ্গ বিভাগ, আর এক দিকে বোমার দুমদুমি। কেহ কি কখন সম্ভব মনে করিয়া-ছিলেন যে, বঙ্গবিভাগ বোমাকে প্রশ্রয় দিবে? সমাজকে নাড়াচাড়া করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। ব্যক্তিগত জীবন যেমন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হয়, সামাজিক জীবনও তেমনই নিয়মের অধীন। ব্যক্তিগত জীবনে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ যে সূত্রে গ্রথিত, সামাজিক জীবনেও তাহাই। একথা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা চাই। ব্যক্তির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত না হইলে ব্যক্তি-সমষ্টির অর্থাৎ সমাজের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইবে না। যে কারণে যে কার্য্য ব্যক্তির জীবনে উৎপন্ন করিবে, অগ্রে তাহা বুঝা চাই। তৎপর ঐ কারণ সমাজে কি ফল উৎপন্ন করিবে, তাহা বুঝা যাইতে পারে। ব্যক্তি-তত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্ব এক না হইলেও এক সূত্রেই গ্রথিত।

জীব বিজ্ঞান শিখাইতেছে যে, এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীববস্তু-পূর্ণ কোষ ক্রমে বিভক্ত ও বিবর্ত্তিত হইতে হইতে নিম্নতম হইতে উচ্চতর জীবদেহ রচনা করিয়াছে। ঐ প্রাথমিক কোষের অঙ্গ বিভাগ ও ক্রিয়া বিভাগ কিছুই ছিল না। উহা ক্রমে বিভক্ত হইয়া বহু-কোষিক জীবদেহ গঠিত করিল। এ দেহে অঙ্গ বিভাগ ও ক্রিয়া বিভাগ ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। মানব সমাজেও তদ্রূপই। প্রাথমিক সমাজে অঙ্গভেদ ও ক্রিয়াভেদ ছিল না। আবশ্যকমত সকলেই সকল কর্ম্ম করিত। ক্রমে সমাজ দেহ যেমন বাড়িয়া

চলিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের নির্দ্দিষ্ট অংশ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিয়োজিত হইল, আর তখন হইতেই সমাজের অঙ্গ ভেদ ও ক্রিয়া ভেদ উৎপন্ন হইল। এইরূপে জীব বিবর্ত্তনের সহিত সমাজ বিবর্ত্তনের নিকট সম্বন্ধ লক্ষিত হইয়া থাকে।

তাহার পর ব্যক্তির কথা বিবেচনা করিতে হয়। পিতৃ মাতৃ শুক্র শোণিতে যে পিণ্ড উৎপন্ন হইয়া থাকে, ব্যক্তি তাহারই পরিণাম। সেই শুক্র শোণিত কত যুগ যুগান্তর হইতে কত কত পূর্ব্ব পুরুষ-গণের দেহ ও মনের উপাদান রাশি বহন করতঃ বর্ত্তমান পুরুষকে রচনা করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পুরুষ পরম্পরায় বিধিনিয়মের অধীন হইয়া সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষদ্বয় কি উপকরণ লইয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের সংমিশ্রণ কালে সেই সকল উপকরণ কিরূপ ভবে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া একীভূত হইয়া গেল, আর কেমন করিয়াই বা বর্ত্তমান পুরুষ রচনা করিল, এ সকল কথা পণ্ডিতগণ এখনও বুঝিতেই পারেন নাই, বলিলেই হয়। তবে যাহা কিছু বুঝিতে পারিতেছেন, তাহাতে এতদূর পর্য্যন্ত বলিতে পারা যাইতেছে যে, মানবকে কাদার মত যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া ভাঙ্গা গড়া যায় না। তাহার একটা জন্মগত ব্যক্তিত্ব আছে, যাহা শুক্র শোণিত সংমিশ্রনের কাল হইতেই নির্দ্দিষ্ট ও সম্পূর্ণ রূপে নিয়মিত। তাহার সেই ব্যক্তিত্ব হইতে এক কথাও এদিক ওদিক হইবার উপায় নাই।* তাহার জীবনে সেই ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত না হইতে পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে এক পথ হইতে অন্য তুল্য পথে ধাবিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তিত করিবার সাধ্য কাহারও নাই। যে বংশানুক্রম হেতু খর্ব্বাকার হইবে, তাহাকে কোন ক্রমেই দীর্ঘকায় করা যাইবে না। যে ঐ হেতু বশতঃ ধীর অথবা চঞ্চল হইবে, তাহাকে অন্যরূপ করা যাইবে না। যে পিণ্ড বুদ্ধির উপকরণহীন, তাহা হইতে কোনক্রমেই শঙ্করাচার্য্য উৎপন্ন হইবে না। তবে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাধীনে যে পিণ্ড হইতে শঙ্করাচার্য্য উৎপন্ন হইল, তাহা অন্যবিধ অবস্থাধীনে বরাহমিহির হইতে পারিত, অথবা নাও পারিত। ভ্রূণতত্ত্ব হইতে ইহাই শিখিতে পাই যে, পুং কীট ও স্ত্রী ডিম্বের সংমিশ্রণে যে শুক্রকোষ উৎপন্ন হয়, তাহার সমস্ত শক্তি অবস্থাধীনে বিকশিত নাও হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে যাহা নাই, তাহা ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবনে কখনই আসিতে পারিবে না। শিক্ষা এ বিষয়ে নিতান্ত নিস্ফল। যাহা আছে, শিক্ষা তাহাকে বাহির করিতে পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাকে প্রকটিত করিতে পারে, অথবা তাহা বিকাশের বাধক হইতে পারে, কিন্তু যাহা নাই, তাহা আনিতে পারিবে না। এই অর্থে ব্যক্তির দৈহিক বিকাশ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট, সুতরাং মানসিক বিকাশও তাহাই। *

ব্যক্তির যদি এই অবস্থা হইল, তবে সমাজের অবস্থা কি হইবে? যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমাজ-দেহ গঠিত, যে সমস্ত শক্তি লইয়া সমাজ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত,

* Nothing can arise in an organism unless the *predisposition to it is pre-existent*, for every acquired character is simply the *reception* of the organism upon a certain stimulous.
Weisman's Heredity Vol. p 172.
also see p. 104 5.

* Mental condition is often caused by physical conditions
Rentoul Race Culture 1906. p. 14

তাহা কত যুগ যুগান্তবের ছায়া বহন করিতেছে, কত অতীত দেশ কালেব পুঞ্জীকৃত উপাদানের পরিণাম! চিবাতীত কাল হইতে সমাজেরও দেহ ও মন, ব্যক্তির ন্যায় একটা নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া আসিতেছে। ব্যক্তির ন্যায় সমাজেবও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটা নির্দ্দিষ্ট আকাব ধাবণ কবিয়াছে, তাহা কি হাতুড়িয়া বৈদ্যের ফুঁ ফাঁতে উড়িয়া যাইবে? ইহা কথনই হইতে পারে না। যে কারণ পরম্পরা যে কার্য্য উৎপন্ন কবিয়াছে, তাহা উহাদিগেব অনিবার্য্য ফল। ব্যক্তির ন্যায় সমাজ-দেহও বংশানুক্রম অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং পাবিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বাবা নিয়মিত হয়। * অতীত কাল হইতে ঐরূপই হইয়া আসিতেছে। এ তিনের পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে উভয় দেহেই পরিবর্ত্তন উৎপন্ন কবা অসম্ভব। সাময়িক বিধি নিষেধ দ্বারা সাময়িক লক্ষণ মাত্র উৎপন্ন হইতে পাবে, কিন্তু স্থায়ী পরিবর্ত্তন সিদ্ধ হইতে পাবে না। স্থায়ী ফল উৎপন্ন কবিতে হইতে স্থায়ী রূপে ঐ ত্রিবিধ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন কবিতে হয়, ইহা অস্বীকাব কবিবাব উপায় নাই। ব্যক্তি ও সমাজের অন্তর্নিহিত বীজশক্তিব পবিবর্ত্তন দীর্ঘকাল অপেক্ষা কবে, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিক্রিয়াও অল্পকালে ফলোৎপাদন করে না। জীব যেমন এক হইতে বহু হইয়াছে, সরল হইতে জটিল হইয়াছে, সমাজেও তাহাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে জীবের ন্যায় সমাজেরও ক্রম-বিকাশ সিদ্ধ হইয়াছে। যদিও ক্রম-বিকাশ হইতে হইতে কখন বা অকস্মাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক ফল উৎপন্ন হয়, কিন্তু উহা সাধারণ নিয়ম নহে। এই কথা বুঝাইবার জন্যই পণ্ডিতগণ এই অবস্থাকে sport অর্থাৎ খেলা নামে অভিহিত কবিয়াছেন। যাঁহারা সাময়িক উৎপীড়ন অথবা একটা মিষ্ট কথা দ্বারা সমাজের গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চালিত করিতে ইচ্ছা করেন, আব তাহা হইতে স্থায়ী ফলের প্রত্যাশা কবেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। তিনি মর্লিই হউন, আব মিণ্টোই হউন, ইহা তাঁহাদিগের সাধ্যাতীত। জীব বহু হইয়াছে, সমাজও বহুবিধ আকার ধারণ করিবে। তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। যাঁহারা বহু সমাজকে মিশাইয়া "একাঙ্গত্ব" সাধন করিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহারা বহুবিধ জীবকে আবাব সেই মৌলিক একটী জীবকোষে পরিণত কবিতে পারেন! উভয়ই তুল্য প্রকার দুবাশা মাত্র। জীব-তত্ত্ব না বুঝিয়া সমাজ-তত্ত্বের মত প্রকাশ করিলে, ফল এইরূপই হয়। দেহ ও মন একসূত্রে গ্রথিত, ব্যক্তি ও সমাজ এক নিয়মেই পরিচালিত। আর সে নিয়ম জীব-বিজ্ঞানের অন্তর্গত, সমাজ-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীশশধর রায়।

* Heredity function and environment.

গীতার ঐতিহাসিকতা।

(গ) মহাভারতের ঐতিহাসিকতা।

খ্রীষ্টীয় মিসনারিগণ যখন গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে অথবা গীতার আধুনিকত্ব প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইতেছেন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা আর এক যুক্তির আশ্রয় লইলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, আদিম মহাভারতে পাণ্ডবাদির কোন কথা ছিল না, উহা পরে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু পাণ্ডব লইয়াই মহাভারত রচিত হইয়াছে। মহাভারত হইতে যদি পাণ্ডবদিগকে অপসৃত করা যায়, তাহা হইলে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা লোপ পায়। এখন দেখা যাউক, তাঁহাদের এই যুক্তি টিকে কিনা।

প্রথমতঃ পাশ্চাত্যেরা-ভারতবর্ষে যে এক-মহাকাব্য (Epic) প্রচলিত ছিল, তহা Dion Chrysostorn লিখিত একখানি পুস্তক হইতে প্রথমে অবগত হন। কিন্তু Dion যে কোথা হইতে এই তথ্য অবগত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা পরিজ্ঞাত নহেন। Dion ৮০ খ্রীঃ অব্দের লোক, কিন্তু খ্রীষ্টজন্মের বহুপূর্ব্বে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন; সেই বুদ্ধদেবের আবির্ভাবেরও বহুপূর্ব্বে যে মহাভারত প্রচলিত ছিল, ললিতবিস্তর ও আদি পালি-ভাষায় লিখিত বহু বৌদ্ধগ্রন্থ হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, কল্পসূত্র-প্রণেতা কাত্যায়ন পাণিনির একখানি বার্ত্তিক লিখিয়াছিলেন। এই বার্ত্তিকে মহাভারতোক্ত ইতিহাসের বিবরণ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যদের মতে কাত্যায়ন খ্রীষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক। সুতরাং খ্রীষ্ট জন্মের বহুপূর্ব্বে মহাভারত প্রচলিত ছিল।

তৃতীয়তঃ, কাত্যায়নের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে আশ্বালায়ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তৎ-প্রণীত গৃহ্যসূত্রে (৩—৪) মহাভারতের উল্লেখ আছে। ইহা ভিন্ন খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্ব্বকার আপস্তম্ভ ও শাঙ্খালায়ন গৃহ্যসূত্রে ভারত ও মহাভারতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্থতঃ, পতঞ্জলি "অসি দ্বিতীয়োঽনুসসার পাণ্ডবম্"—এই উদাহরণের দ্বারা মহাভারতকে লক্ষ্য করিতেছেন। সুতরাং পতঞ্জলির পূর্ব্বে যে মহাভারত ছিল, তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে।

পঞ্চমতঃ, পতঞ্জলি যে ব্যাকরণের মহাভাষ্য লিখিয়াছেন, সেই পাণিনি ব্যাকরণই মহাভরতের ঐতিহাসিকতার জ্বলন্ত প্রমাণ। এই ব্যাকরণখানি একটী অতি প্রাচীন পুস্তক। এমন কি, ইংরাজ পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। গোল্ড-ষ্টুকার সাহেব বলেন যে, পাণিনি খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। ম্যাকস্‌মূলার বলেন যে, খ্রীষ্ট জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মান্দ্রাজের অন্তর্গত থিয়োজফিক্যাল্ সোসাইটীর এডিয়ার পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ভাষ্যাচারির (N. Bhashya-charya) "The Age of Patanjali" নামক গ্রন্থে বহুগবেষণা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পতঞ্জলি খ্রীঃ পূঃ ৯ম

হইতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হন। তিনি পাণিনি ব্যাকরণের একখানি মহাভাষ্য লিখিয়াছিলেন। তিনি যখন খ্রীঃ পূঃ দশম শতাব্দীর লোক, তখন পাণিনি যে তাহার পূর্ব্বকার, তাহা বলাই বাহুল্য। ডাক্তার মার্টিন হোগ পাণিনিকে খ্রীঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পাণিনি যে মহাভারত প্রতিপাদ্য বিষয় অবগত ছিলেন, তাহা অষ্টাধ্যায়ীর ৪।১।৪৫, ৪।৩।৯৮, ৬।২।৭৫, ৮।৩।৩৫ প্রভৃতি সূত্র পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, আমরা পাণিনি ব্যাকরণে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি পাইয়া থাকি। যথা,—

(১) "মহান্ ব্রীহির্গৃষ্টীষাসজাবালভারভারত হৈলিহিল রৌরব প্রবৃদ্ধেষু।" (৬—২—৩৮)

অর্থাৎ ব্রীহি প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে একটী শব্দ 'ভারত'। সুতরাং আমরা 'মহাভারত' নাম পাইলাম।

(২) "গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ"। (৮-৩-৯৫)

অর্থাৎ গবি ও যুধি শব্দের পর স্থির শব্দ প্রয়োগ হইলে উহার 'স' স্থানে 'ষ' হইয়া থাকে। এখানে আমরা 'যুধিষ্ঠির' নাম পাইলাম।

(৩) "বহ্বচ ই ঞ প্রাচ্যভরতেষু"। (২-৪-৬৬) এস্থলে সিদ্ধান্তকৌমুদী ভারত গোত্রের উদাহরণ "যুধিষ্ঠিরাঃ" দিয়াছেন।

(৪) "স্ত্রিয়ামবন্তি কুন্তি কুরুভ্যশ্চ" (৪-১-৭৬)' এস্থলে 'কুন্তি' নাম পাওয়া গেল।

(৫) "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন" (৪-৩-৯৮) অর্থাৎ, বাসুদেব ও অর্জ্জুন শব্দের পরে ষষ্ঠ্যার্থে বুন্ হয়। এখানে বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নামও পাওয়া যাইতেছে।

(৬) "নভ্রাণ্ নপান্নবেদানাসত্যানমুচি নকুলনখনপুংসকনক্ষত্রনক্রনাকেষু"। (৬-৩-৭৫) এখানে 'নকুলের' নাম পাওয়া যাইতেছে।

(৭) "ধর্ম্মেণ স্ম কুরবো যুধ্যন্ত" (৩-২-১১৮) এখানে 'কুরুদের' নাম পাওয়া যাইতেছে।

(৮) "দ্রোণপর্ব্বতজীবন্তাদন্যতরস্যাম্।" (৪-১-১০৩) এখানে 'দ্রৌণায়ন' শব্দ পাওয়া যাইতেছে। 'দ্রৌণায়ন' অর্থে কেবল অশ্বত্থামাকেই বুঝাইয়া থাকে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত সূত্রগুলি হইতে পাণ্ডবাদির নাম পাওয়া গিয়া থাকে।

পাণিনি ব্যাকরণোক্ত উপরিলিখিত প্রমাণগুলি ভিন্ন বেদোক্ত কোন কোন ব্রাহ্মণে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমকালবর্ত্তী বা অচির পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণের উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পারাশর্য্য (বেদব্যাস) ও তৎশিষ্য বৈশম্পায়নের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পরীক্ষিৎ ও জনমেজয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"এতেন হবা ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেন তুরস্ত কাবষেয়োঃ জনমেজয়ং পারীক্ষিতমভিষিষেচ তস্মাদ্ জনমেজয়ঃ পারীক্ষিতঃ সমন্তং সর্ব্বতঃ পৃথিবীং জয়ন্ পরীয়াচ।" (৮-২১)।

শতপথ ব্রাহ্মণে অর্জ্জুনের উল্লেখ আছে। ইহাতে আমরা আরও পরীক্ষিৎ ও জনমেজয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা,—

"এতেন ঐন্দ্রতোদৈবাপঃ শৌনকঃ। জনমেজয়ং পারীক্ষিতং যাজয়াং চকার তেনেষ্টা সর্ব্বাং পাপকৃত্যাং সর্ব্বাং ব্রহ্মহত্যামপজঘান।" (১৩-৫-৪-১)।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় পাঠকে ধৃতরাষ্ট্রের নাম পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন বাজসনেয়-সংহিতায়

'অর্জ্জুনের' উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যজুর্ব্বেদে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, কুরু ও পাঞ্চালের কুটুম্বিতায় কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

কোন পুস্তকের নাম এবং ঐ পুস্তকের নায়কদিগের নাম এবং তাহাদের ঘটনা সকল যদি অপর কোন পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে শেষোক্ত পুস্তক প্রণয়নের সময় প্রথমোক্ত পুস্তকখানি প্রচলিত ছিল। সুতরাং পাণিনির সময় যে মহাভারত এবং মহাভারতোক্ত নায়কগণের নাম প্রচলিত ছিল.তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, পাণিনি খ্রীষ্ট জন্মের দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং মহাভারত যে ঐ সময়েরও পূর্ব্বকার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এতদ্ সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর মত এই যে, "তবে ইহা স্থির যে, খ্রীষ্টের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির বৃত্তান্ত সংযুক্ত মহাভারত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এমন প্রচলিত যে পাণিনিকে মহাভারত ও যুধিষ্ঠিরাদির ব্যুৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। আর ইহাও সম্ভব যে,তাঁহার অনেক পূর্ব্বেই মহাভারত-প্রচলিত হইয়াছিল। কেননা, "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্" এই সূত্রে 'বাসুদেব' ও অর্জ্জুনক' শব্দ এই অর্থে পাওয়া যায় যে, বাসুদেবের উপাসক, অর্জ্জুনের উপাসক। অতএব পাণিনিসূত্র প্রণয়নের পূর্ব্বেই কৃষ্ণার্জ্জুন দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। * * * * কৃষ্ণ এত প্রাচীন কালের যে, পাণিনির সময়ে উপাস্য বলিয়া আর্য্য সমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন।"

ডাক্তার দহলমান (*Dr. Dahlman*) আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র, পাণিনির ব্যাকরণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, বুদ্ধদিগের জাতক এবং জৈনদিগের ধর্ম্ম কথার উপাখ্যানগুলির সাদৃশ্য দেখিয়া এবং অন্যান্য প্রমাণের আলোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্ত্তমান মহাভারতের কাব্যাংশ খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে অতি সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে বর্ত্তমান ছিল।

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা।

পূর্ব্বোক্ত মিসনারিগণ মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব নষ্ট করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর আক্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা অবগত আছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের একজন প্রধান নায়ক। যদি কোন ক্রমে শ্রীকৃষ্ণকে মহাভারত হইতে দূরীভূত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে গীতার জন্য আর কাহারও তত আগ্রহ থাকিবে না এবং তাহা হইলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে। ঐ সকল ইংরাজগণ ঘোষণা করিতেছেন যে, কৃষ্ণ বলিয়া আদৌ কোন ব্যক্তি ছিলেন না এবং তাঁহার নামও মহাভারতে উক্ত হয় নাই, পরে তাঁহাকে মহাভারতের ভিতর অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই যুক্তি কতদূর বলবতী, তাহা দেখা যাউক।

এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে, অন্যত্র যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা প্রয়োজন। গ্রীক যবন মেগাস্থিনিস্ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, তখন মথুরায় কৃষ্ণপূজা প্রচলিত ছিল। ইহাতে Macdonell সাহেব বলেন যে, সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত হইতেন।

ইহা খ্রীষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর কথা। তখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এখন দেখা যাউক, বৌদ্ধগ্রন্থে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে কিনা। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ সূত্র-পিটকে কৃষ্ণ অসুর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ললিতবিস্তরের একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা —"প্রতিকৃতী রুদ্রস্য কৃষ্ণস্য বা।" ইহা ভিন্ন গুর্জ্জর রাজাদের ৪র্থ শতাব্দীস্থ তাম্রলিপিতে কৃষ্ণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা— "শ্রীমহাজন্মারুষ্ণহৃদয়াহিতাস্পদঃ কৌস্তভ মনিরিব।" ২য় শতাব্দীস্থ আর একটী তাম্রলিপিতে শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা "কৃষ্ণবসন্ত আরাম।" নসীকের নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বতগুহায় খোদিত লিপিতে শ্রীকৃষ্ণাদির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—"রামকেশ-বোর্জ্জুনভীমসেনতুল্যপরাক্রম।" ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, কৃষ্ণ-প্রসিদ্ধি নূতন নহে। এইবার হিন্দুশাস্ত্রোক্ত প্রমাণ সকলের আলোচনা করা যাউক।

খ্রীষ্ট জন্মের কিছু পরেই যে, সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্যরা অনুমান করিয়া থাকেন, সেই সকল গ্রন্থে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ পাওয়া যায় কিনা, তাহাই প্রথমে আলোচনা করা যাইতেছে। তাহার পর খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা, সেই সকল গ্রন্থে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ পাওয়া যায় কিনা, তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে। পাশ্চাত্যদের মতে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে সঙ্করবিজয় নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থে আমরা কৃষ্ণকে অবতার বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাই। যথা,—"রামকৃষ্ণাদ্যবতারবিভেদেন" ইত্যাদি। তাঁহাদের মতে বাসবদত্তা খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছে। সেই বাসবদত্তাতে হরিবংশের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—"হরিবংশৈরিব পুষ্কর প্রাদুর্ভাব রমণীয়ৈঃ।" হরিবংশে যে শ্রীকৃষ্ণাদির কথা পাওয়া যায়, তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্যমাত্র।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকের মত এই যে, খ্রীষ্টজন্মের অনেক পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে। শ্রীরামের বহু ব্যবহিত অধস্তনপুরুষ রাজা বৃহদ্বল ভারত-সমরে অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন (বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ৪র্থ অধ্যায়)। মহাভারতে রাম-চরিত ও রাম নাম মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায় (বনপর্ব্ব, ৮৫ অধ্যায়)। বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতে (সভা, ৮ অধ্যায়) আমরা দেখিতে পাই যে, যুধিষ্ঠির অযোধ্যাধিপতি বৃহদ্বলের সমসাময়িক ছিলেন। এই বৃহদ্বল আবার শ্রীরামের ৬ পুরুষ অধস্তন ছিলেন (মহাভারত, বন, ২৭৫-২৯০)। এই সকল কারণে অনেকে বলেন যে, মহাভারত রচিত হইবার পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে। আমরা রামায়ণে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা,—

"উৎপৎস্যতেহি লোকেহস্মিন্ যদূনাংকীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
বাসুদেব ইতিখ্যাতো বিষ্ণুঃপুরুষবিগ্রহঃ ॥ ২০
ভারাবতরণার্থং হি নরনারায়ণাবুভৌ।
উৎপৎস্যেতে মহাবীর্য্যৌ কলৌযুগ উপস্থিতে॥২২

(উত্তর—৬৩)

অর্থাৎ যদুবংশীয়গণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন বাসুদেব নামে বিখ্যাত ভগবান বিষ্ণু পুরুষদেহ ধারণ করিবেন। কলিযুগ উপস্থিত হইলে, সেই মহাবীর্য্যবান্ নর এবং নারায়ণ ঋষি

ধরাভার হরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন। আমরা রামায়ণের এই স্থলে বিষ্ণুর অবতার বাসুদেবের উল্লেখ পাইতেছি। সুতরাং মহাভারত রচিত হইবার পূর্ব্বেও যে বাসুদেব বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন, তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে।

কালিদাসের মেঘদূতে (১।১৫), ললিতবিস্তরে (১১ অধ্যায়), খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে খোদিত লিপিতে (Journal of the R A S. N. S , Vol I) এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (১।৪।৯২, ৪।১।১৪, ৫।৩।৯৯) কৃষ্ণ প্রসঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পতঞ্জলি লিখিয়াছেন যে—"নাবদোঽপি অথ কৃষ্ণস্য পরম্ মেনে * * * শাশ্বতত্বম্" (১২।২০৭।৪৮)। পাণিনি "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাম্ বুন্" (৪।৩।৯৮)—এই সূত্রের দ্বারা বাসুদেব অর্থে শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

পাণিনিতে 'কৃষ্ণ' শব্দটীর উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু 'বাসুদেবের' দ্বারা যে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করা হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৬৬ অধ্যায়োক্ত পৌণ্ড্রক রাজার উপাখ্যান হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পৌণ্ড্রক রাজা তাঁহার পরিষদগণের তোষামোদে মত্ত হইয়া নিজেকে 'বাসুদেব' বলিয়া স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে একদা বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আমিই একমাত্র বাসুদেব,—অন্য কেহ নহে, প্রাণীদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছি। তুমি মিথ্যা 'বাসুদেব' নাম পরিত্যাগ কর। হে যাদব! তুমি মূঢ়তাবশতঃ আমার যে সকল চিহ্ন ধারণ করিতেছ, সে সকল পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আসিয়া শরণাগত হও; নতুবা আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর।" উহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃশব্দে হাসিয়া উঠিলেন এবং তৎপর তাঁহাকে যুদ্ধদান করিতে উদ্যোগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধস্থানে গিয়া দেখিলেন যে পৌণ্ড্রক, শঙ্খ, শ্রেষ্ঠ খড়্গ, গদা, শার্ঙ্গধনু ও শ্রীবৎস-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়াছেন; কৌস্তুভ ধারণ করিয়াছেন; বনমালায় ভূষিত হইয়াছেন, পীতবর্ণ পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়াছেন এবং অমূল্য চূড়াভরণ ধারণ করিয়াছেন। তাহার কর্ণে মকর কুণ্ডল শোভমান। কৌষেয় বসন পরিধান করিয়া সে কৃত্রিম গরুড়োপরি উপবিষ্ট রহিয়াছে। রঙ্গ প্রবিষ্ট নটের ন্যায়, কৃত্রিম বেশধারী সেই পৌণ্ড্রককে আত্মতুল্য দর্শন করিয়া, হরি অত্যন্ত হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—"অহে পৌণ্ড্রক! তুমি আমাকে যে সকল অস্ত্র ত্যাগ করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলে, আমি তোমার প্রতি সেই সকল অস্ত্র ত্যাগ করি। তুমি অনর্থক আমার যে নাম ধারণ করিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ করাই।" এই বলিয়া চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন।

উপরে লিখিত পৌণ্ড্রক রাজার উপাখ্যান হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণই 'বাসুদেব' নামে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং পাণিনিতে যে বাসুদেবের কথা উল্লেখ আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করিতেছে।

'কৃষ্ণ' শব্দটী পাণিনিতে না থাকিলেও ঋগ্বেদসংহিতার অনেক স্থলে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকে এবং ১১৬ সূক্তের ৭ ঋকে এক 'কৃষ্ণের' উল্লেখ আছে। এই কৃষ্ণ যে কে, তাহা বলা দুরূহ।

পাণিনির সূত্রেতে আমরা নিম্নলিখিত উদাহরণ গুলি দেখিতে পাই। যথা—"কংসং বধমাচষ্টে" ও "কংস ঘাতয়তি" (৩-১-২৬) (২) "জঘান কংসং কিল বাসুদেব" (৩-২-১১) (৩) "অসাধুর্মাতুলে কৃষ্ণঃ" (২-৩-৩৬) এবং "সঙ্কর্ষণ দ্বিতীয়স্য বলং কৃষ্ণস্য বর্দ্ধতাম" (২-২-২৩)। এই সকল উদাহরণ গুলি যে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের খিল কাণ্ডে আমরা শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা,—"উদ্ধৃতানি বরাহেন কৃষ্ণেন শত বাহন।" ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের খিল সূক্তে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। যথা,—"কৃষ্ণ বিষ্ণু হৃষীকেশ বাসুদেব নমোঽস্তুতে" ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের ১৭শ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"অথৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকী পুত্রায় উক্ত্বা উবাচ। অপি পাস এব স বভূব। সোঽন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি।"

অর্থাৎ, আঙ্গিরস বংশীয় ঘোর নামা এক জন ঋষি দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া বলিলেন যে,অন্তকালে এই তিনটী কথা অবলম্বন করিবে, "তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, এবং তুমি প্রাণ সংশিত।"

উপনিষদ হইতে আরণ্যক প্রাচীনতর। আমরা সেই আরণ্যকের মধ্যে তৈত্তরীয় আরণ্যকে (১০-৬ ৬) কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু আবার আরণ্যক হইতে ব্রাহ্মণ আরও প্রাচীনতর। আমরা কৌষীতকী ব্রাহ্মণে পূর্ব্বোক্ত আঙ্গিরস ঘোরের নাম এবং কৃষ্ণেরও নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। সেখানে কৃষ্ণ দেবকীপুত্র বলিয়া বর্ণিত হন নাই, আঙ্গিরস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আমরা পুরাণাদিতে দেখিতে পাই যে কতকগুলি সূর্য্যবংশীয় রাজা আঙ্গিরস বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। হরিবংশে উল্লিখিত হইয়াছে যে,— "ইক্ষ্বাকুবংশাদ্ধি যদুবংশো বিনিঃসৃত" (বিষ্ণু পর্ব্ব, ৯৫। ৫৩৯),—অর্থাৎ মথুরার যাদবেরা সূর্য্যবংশীয়। সুতরাং খুব সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণও আঙ্গিরস ছিলেন।

বেদে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বোক্ত আঙ্গিরস ঋষির পুত্র,পৌত্র প্রভৃতি ছিল। ইঁহারা সকলেই ঋষি ছিলেন। ঘোরের পুত্রের নাম কণ্ব। কণ্বের পুত্রগণের নাম মেধাতিথি ও প্রস্কণ্ব। কণ্ব, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩৬ সূক্ত হইতে ৪৩ সূক্তের ঋষি। মেধাতিথি ঐ মণ্ডলের ১২ হইতে ২৩ সূক্তের ঋষি। প্রস্কণ্ব ঐ মণ্ডলের ৪৪ হইতে ৫৫ সূক্তের ঋষি। ঘোরের পুত্র ও পৌত্রদ্বয় যদি ঐসকল সূক্তের বক্তা হন, তাহা হইলে, ঘোরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সমসাময়িক।

আমরা ঋগ্বেদে দেখিতে পাই যে, এক জন কৃষ্ণ অনেকগুলি সূক্তের ঋষি; যেমন অষ্টম মণ্ডলের ৮৫, ৮৬ ও ৮৭ সূক্তের এবং দশম মণ্ডলের ৪২, ৪৩ ও ৪৪ সূক্তের ঋষি। অনেকে হয়তো বলিতে পারেন যে, এই ঋষি-কৃষ্ণ, ক্ষত্রিয়-নন্দন কৃষ্ণ নহেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় হইলে যে ঋষি হইতে পারা যায় না, এমন কিছু মানে নাই। বেদে শূদ্র ঋষিদের নামেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন অজমীঢ়, মান্ধাতা, প্রতর্দ্দন প্রভৃতি ক্ষত্রিয় ঋষিদের নামেরও উল্লেখ আছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণ-ঋষি ক্ষত্রিয় নন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতে হইতে পারেন—সে বিষয়ে কোন আপত্তি করিবার কারণ নাই। "যিনি